আষাঢ়ে ভূতের গল্প

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ASHARE BHOOTER GALPA

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৯

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

লেখাপড়া

সূর্য অস্ত যায়। গাছের মাথায় ভূত-পেতনীরা জেগে ওঠে।

সারাদিনের নিশ্চিন্ত নিদ্রা শেষে কেউ নাচে কেউ গায় কেউ খেলে কেউ খায়।

সকলেই যখন হৈ-হুল্লোড়ে ব্যস্ত, নিম গাছ বাসীন্দা কিম ভূতের আর তর সয়না। সর্ সর্ করে গাছ বেয়ে নেমে, লম্বা লম্বা পা ফেলে খাবারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

এ বন সে বন, এ পাড়া সে পাড়া কোথায় যে কখন খাবার মেলে তার ঠিক নেই।

কিম ভূত বেরিয়ে পড়লে ভূতির আর কোনও কাজ থাকেনা। একলাটি গাছে চুপটি করে বসে থাকে। গালে হাত রেখে বসে বসে ভাবে, কিম ভূত যদি মানুষের মত লেখাপড়া শেখে কি মজাই হয়।

এই ভূতের দেশে তাদের সম্মান তো বাড়বেই। তাছাড়াও একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে নিলে যা আয়পয় হবে, তা দিয়ে তারা দিব্যি ভালো ভালো খেতে পারবে, পরতে পারবে, বেড়াতে পারবে উপরন্তু পোড়া এই নিমগাছ ছেড়ে লাল সিমেন্টে সান বাঁধানো কোনও ঝাঁকড়ালো অশ্বত্থ গাছের মাথায় মনের মত বাসা বাঁধতে পারবে।

এই অসভ্য ভূত-পেতনীদের সঙ্গে আর কোনও সম্বন্ধ থাকবেনা।

এমনি এক সুখের দিনের কথা ভাবতে ভাবতে ভূতির জিবে জল এসে পড়ে। তারপর সেই জল টস্ টস্ করে গড়িয়ে পড়ে দুপাশের কশ বেয়ে মাটিতে।

প্রতিদিনই সে ভাবে এই কথা। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়না। মনের দুঃখ তার মনেই চাপা পড়ে থাকে।

কিম ভূতের কাছেও তা মুখ ফুটে বলার মত সাহস তার নেই। যা খিটখিটে তার মেজাজ। কোনও কথা মনঃপুত না হলে আর রক্ষে নেই।

হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করে তো চীৎকার করবেই। আর মাথায় যদি একবার

বায়ু চড়ে যায় তাহলে কম করেও ডজন খানেক গাঁট্টা তো খেতে হবেই তাকে। কোনভাবেই রেহাই নেই।

এমনকি তখন আকাশ থেকে স্বয়ং মা কালী নেমে এলেও তাকে বিরত করতে পারবেনা।

মনের এই চাপা দুঃখ নিয়েই সে একদিন এক মতলব ভাঁজল।

মাঝরাতে কিম ভূতের বাসায় ফেরার সময় সে কাছেই এক ফাঁকা তেঁতুল গাছের মাথায় উঠে মৃতের মত নির্জীব হয়ে পড়ে রইল। এমনই চুপিচাপি সে এই কাণ্ডটা করল যে পাড়া-প্রতিবেশী কেউই তা টের পেল না।

এদিকে কিম ভূত সেদিন ঘুরে ঘুরে একজোড়া ঢোঁড়া সাপ কোঁচড়ে নিয়ে হেলে দুলে বাসায় ফিরল।

অন্যান্য দিন ভূতি আগে থাকতেই তৈরী হয়ে থাকে। কিম ভূত ফিরলেই গামছা আর গাড়ু এগিয়ে দেয়। সে এটা সেটা যাই আনুক না কেন খাবার ঘরে টাঙিয়ে রেখে হাত পা ধুতে যায়।

ইতিমধ্যে ভূতি পাকের কাজ সেরে ফেলে। শালপাতার ঠোঙায় করে সুমুখে সাজিয়ে রাখে।

সে ফিরে এসে পায়ের ওপর পা তুলে বসে গাছের মগডালে। মেজাজটা যেদিন খুশী খুশী থাকে, খেতে খেতে মজার মজার গপ্প ফাঁদে। ভূতি শুনে হেসে গড়াগড়ি খায়। মেজাজ যেদিন খিঁচড়ে থাকে, একটা কথাও কয়না। কড়মড় করে হাড়গুলো চিবিয়ে বা চক্ চক্ করে চুষতে চুষতে উঠে যায় ভূতির সুমুখ থেকে। তারপর গোমড়া মুখে বসে থাকে মগডালে উঠে। এটাই ছিল তার দিনলিপি। এতেই হয়ে উঠেছিল সে অভ্যস্ত।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ তার ব্যতিক্রম ঘটল। ভূতিকে সাপ দেখিয়ে একটা চমক দেবার জন্য, সে বার বার তার নাম ধরে ডাকতে লাগল কিন্তু কোন সাড়াই মিলল না।

উপরন্তু সেই ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরতে লাগল ভূতুড়ে সেই বনাঞ্চলে।

এমন ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। তাছাড়া ভূতি যে রাম ভীতু সে কথা সে ভালোভাবেই জানে।

একা একা দূরে কোথাও যাওয়ার মত তার সাহস নেই। এক যদি তাকে কোনও বজ্জাত ভূতে-ধরা ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে।

সেও তো খুব সোজা ব্যাপার নয়। আশপাশে কয়েক হাজার ভূত-পেতনী কিলবিল করছে। একবার শুধু 'মলুম' বললেই যথেষ্ট। তারা যে যতোই নিষ্ঠুর হোক কেউ 'মলুম' বললে আর রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তারা সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রু বিনাশে।

আর সেই কারণেই ব্যাপারটা খুব রহস্যময় ঠেকল তার কাছে! কিন্তু সে হতাশ হবার পাত্র নয়। গরু খোঁজার সংকল্প নিয়েই সে নেমে পড়ল

নিমগাছ থেকে।

আগের দিন বৃষ্টি হয়ে গাছের গোড়ায় কাদা জমেছিল। নরম মাটিতে ভূতির পায়ের ছাপ খুঁজতে লাগল। ছাঁচি পানের মতোই চ্যাপটা ছিল ভূতির পা। এক নজরেই তা চোখে পড়ে গেল।

এবার সেই পায়ের ছাপ ধরেই কিমভূত এগুল। এবং সেই তেঁতুল গাছের নীচে পেঁছিল।

আর কোনও কথা নয়। সে তর্‌তর্‌ করে উঠে পড়ল সেই তেঁতুল গাছের মগডালে। তার গোয়েন্দাগিরি ব্যর্থ হল না। পা টিপে টিপে ওপরে উঠে ভূতিকে নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে দেখল সেখানে।

'ভূতিসোনা' 'ভূতিসোনা' বলে সে কয়েকবার ডাকলো। কোনও সাড়াশব্দ নেই। তবে কি তার রাগ হল! কিম ভূত এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল বসে।

তার কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বললে, রাগ করিস নি। এই দেখ তোর জন্যে ঢোঁড়া সাপ এনেছি। তুইতো সাপ খেতে খুব ভালোবাসিস। সাপ দেখলে তো তোর জিব দিয়ে জল পড়ে!

কিন্তু ভূতির মুখে কোনওরকম ভাবান্তর দেখা গেল না। সে তেমনই নিঃসাড়ে পড়ে রইল।

কিম ভূত তার গোঁসা ভাঙ্গতে অনেক চেষ্টা করল। সব চেষ্টা ব্যর্থ হতে এবার তার মাথা গরম হতে শুরু করল। আর সে ধৈর্য ধরতে পারল না। খট্‌ খট্‌ করে তার মাথায় কটা গাঁট্টা কষিয়ে বলল, এত মিষ্টি কথা বলছি তবুও গ্রাহ্যি নেই। সাহস তো কম নয় তোর।

এদিকে গাঁট্টা খেয়ে ভূতির মাথা ফুলে আলু। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল কটকটানি আর ঝনঝনানি।

ভূতির কান্না পেল। তবুও সে কাঁদল না। কিমভূতের মাথা গরম হলে সে যে এমন কাণ্ড করে, সে তো ভালো করেই জানে। তাই সবকিছু মুখ বুজে হজম করেই সে পড়ে রইল সেখানে।

গাঁট্টা মারার পরেও ভূতিকে নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে দেখে এবার কিম ভূতের ভয়ে গা ছমছম করে উঠল। ভাবল তবে কি সে পরলোক ছেড়ে চলে গিয়েছে? কিন্তু ভূতেরা তো এত সহজে পরলোক ছেড়ে যেতে পারে না। ইহলোকে যেতে তো অনেক সাধ্যি-সাধনা করতে হয়।

এটা একটা অঘটন মনে হতেই তার হঠাৎ কান্না পেতে লাগল আর গরম মাথাটা ধিকি ধিকি করে তাপ কমে গিয়ে ঠাণ্ডা হিম হয়ে এল।

ভূতির মুখের দিকে চেয়ে সে বসে রইল কিছুক্ষণ। তাকে ছেড়ে সে থাকবে কি করে। কার সঙ্গেই বা বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্‌বক্‌ করবে সে। অথচ বক্‌বক্‌ না করলে তার খিদেও পায়না ঘুমও আসে না।

বিয়োগ ব্যথায় কিম ভূতের দু চোখ ফেটে এক ফোঁটা জল ঝরল মাটিতে। আবার কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, তুই জীবিত থাকলে তোকে একটা বর দেব। সেই বরে তুই আমার কাছে যা চাইবি তাই পাবি। এমন সুযোগ হেলায় হারাসনি।

ভূতি এতক্ষণ দম বন্ধ করেই পড়েছিল।

সে এই প্রতিজ্ঞা করা মাত্রই আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠতে উঠতে বলল, তোর বর পাওয়ার লোভেই কাঁচা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

না চাইতেই বর পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার, কি বলিস?

ভূতি যে এত তাড়াতাড়ি উঠে বসবে, কিম ভূত ভাবতেই পারেনি। সে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দু হাতে চোখ ঘষতে ঘষতে সে বললে, কিরে তুই বেঁচে আছিস তাহলে। আমি ভাবলাম তুই ইহলোকে চলে গিয়েছিস!

ভূতি একগাল হেসে বললে, ধ্যুৎ তা কি হয়। তোকে ছেড়ে যেতে পারি কখনও?

আমাদের নিমগাছের বাসাতে ভয়ানক মশার উৎপাত বেড়েছে। তুই যখন বাইরে গিয়েছিলি। ওরা দলবেঁধে এসে হুলের খোঁচায় আমাকে নিমগাছ থেকে তুলে নিয়ে এসে এই তেঁতুল গাছে ফেলল।

ভেবেছিল এখানে নিশ্চিন্তে বসেই কামড়াবে। তুই টেরটি পাবিনা। কিন্তু তুই যে হঠাৎ এখানে চলে আসবি ভাবতেই পারেনি।

আর তা থেকেই এই কেলেঙ্কারী কাণ্ড!

কিম ভূত গোমড়া মুখে কয়েকমুহূর্ত বসে থেকে কি যেন ভাবল। তার মুখের দিকে পিট পিট করে তাকিয়ে বললে, কথা দিয়েছি যখন রাখতেই হবে। এখন তুই কী চাস বল—

ভূতির সদিচ্ছা পূর্ণ হল। আর এর জন্যই এই সাতকাণ্ড নাটক।

ভূতি মুচকি হেসে বললে, তুই লেখাপড়া শিখে ভূতেদের মুখের চুনকালি মুছে দে এটাই আমি চাই। আর কিছু নয়।

কিম ভূত পিট পিট করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কি বললি! আর একবার শুনি?

ভূতি আবার সেই একই কথা বলল।

লেখাপড়ার নাম শুনে কিম ভূতের মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরে উঠল। গা বমি-বমি ও হাত পা ঝিম ঝিম করতে লাগল। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। পা টলতে লাগল।

থ' মেরে সে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আধকাঁদো স্বরে বললে, আমাদের ভূতজাতের চোদ্দ কোটি পুরুষেও কেউ কখনও লেখাপড়া শেখেনি।

লেখাপড়া না শেখাই ভূতজাতির গৌরব। সেই গৌরব তুই আমাকে ভেঙ্গে ফেলতে বলছিস। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে তুই একটু ভেবে দেখ।

ভূত যে প্রসঙ্গটিকে ধামাচাপা দিতে চাইছে তা বুঝতে ভূতির কোনই অসুবিধা হল না। তবুও সে নাছোড়বান্দা।

ইনিয়ে বিনিয়ে বলল, তা হোক। একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক্না। আমরা তো সেকেলে নই একেলে ভূত। নতুন কিছু একটা না করলে কি চলে!

সে দেখল আপত্তি করে বিশেষ লাভ নেই। ভূতির মাথায় একবার ঢুকেছে যখন ছাড়বে না। তার চেয়ে মেনে নেওয়াই ভালো।

ভূতির আনন্দের সীমা নেই। বইয়ের খোঁজে সে এদিক সেদিক দৌড়া-দৌড়ি শুরু করে দিল। উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল সব গেরস্থ বাড়ীতে। বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে রামায়ণ-মহাভারত সবই তার চাই। সুযোগ পেলেই গোছা গোছা বই জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে নিয়ে আসতে লাগল। কদিনের মধ্যেই নিমগাছের মাথায় ছোটখাটো একটা বইয়ের পাহাড় বানিয়ে ফেলল সে।

বই যোগাড়ের কাজ শেষ হতে এবার পড়া শুরু হবার পালা।

রঙচঙে বই হাতে পেয়ে কিম ভূতের উৎসাহের শেষ নেই। গড় গড় করে সে বর্ণপরিচয়-খানা একদিনে শেষ করে ভূতির মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, নে পড়া ধর—

এক একদিনে এক একটা বই শেষ করতে দেখে ভূতিও খুবই খুশী হল। এভাবে পড়াশুনা চালালে কিম ভূত তো একবছরে বিদ্যের জাহাজ হয়ে যাবে।

কৌতূহলবশত ভূতি পড়া ধরে। কিন্তু সঠিক উত্তর দিতে পারে না কিম ভূত।

ভুলের পর ভুল। ভূতি বিরক্তই হয়। বলে, কিরে! কি শিখলি, সবই যে ভুল বলছিস।

সে মুখ কাঁচুমাচু করে। এ বদনামের জন্য সে তৈরী ছিল না। ভূতি তাকে আর একবার বইটা পড়ে নেবার সুযোগ দিল। আবার সেই একই অবস্থা। আবার সে সব ভুল বলল!

কিম ভূত মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। যতক্ষণ পড়ছি বেশ মনে থাকছে। যেই বই বন্ধ করছি সব ভুলে যাচ্ছি। বইয়ের পাতাগুলো ধবধবে সাদা মনে হচ্ছে।

ভূতি এবারে একটু চটে গেল। ধ্যুৎ, তোর লেখাপড়া হবেনা। এখন দেখছি চেষ্টা বৃথা। তারচেয়ে বরং আমি শিখি। কী আর করা যাবে।

এবার ভূতির পড়ার পালা। ইচ্ছেটা যেহেতু তার, সে আরও উৎসাহ
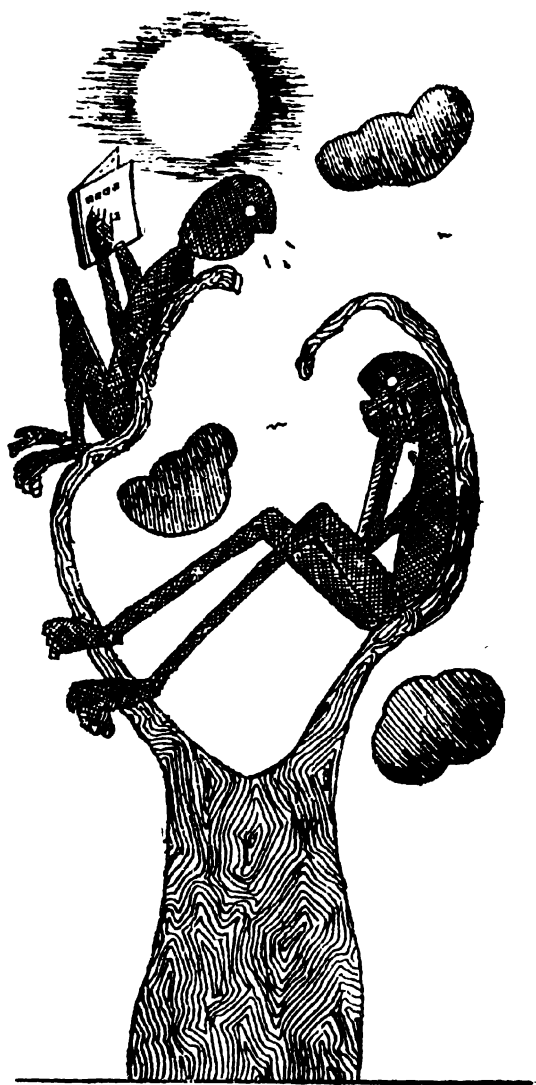
কোনও ব্যাপারই নয়।   নে পড়া ধর—

নিয়ে পড়তে শুরু করল।

তারও ওই একই অবস্থা। বই চোখের সামনে মেলে ধরলেই মনে হয় পড়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পড়া ধরলেই অঘটন! সবকিছুই ভোঁ-ভোঁ!

ভূতির চোখে জল জমে গেল।

পিঁউ পিঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, হ্যাঁরা এমন কেন হচ্ছে রে? আমরা তো চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছি না।

কিম ভূত ওর মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে বললে, দেখি শব্দটা কেমন হয়—

'ঢ-প্!'—হুম যা ভেবেছি তাই।

বুঝলি কিছু। মাথা আছে কিন্তু মাথার ভেতরে ফাঁপা। ঘিলু বলে কিছু নেই। আর সেইজন্যই 'ঢপ্' করে শব্দ হল।

ভূতিও সঙ্গে সঙ্গে কিম ভূতের মাথায় একটা গাঁট্টা মারল। 'ঢ-প' ওই একই শব্দ হল কিমভূতের মাথায়।

হতাশায় ভূতি ডুকরে কেঁদে উঠল। দেখাদেখি কিম ভূতও ভূতির সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

গায়ের রঙ

বর্ষাকাল। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে।

কিম ভূতের ক'দিন ধরেই নাক সড়সড় করছিল। পেঁকাটির ধোঁয়া টানতে টানতে বললে, বৃষ্টি পড়ছে বাইরে বেরুব। তুই কী বলিস?

ভূতি কাঠ জ্বালিয়ে বেগুন সেঁকছিল। কিম ভূতের প্রশ্ন শুনে মুখ তুলে তাকাল। গম্ভীর হয়ে বললে, ব্যারাম হয়েছে। নাইবা বেরোলি। তোর নাক সড সড় করা নয়ত, একটা রোগ বাধাবিই। আমি আর সেবা করতে পারব না আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি।

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে কথাগুলো তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, আবার সে বেগুন সেঁকায় মন দিল।

কিম ভূত তখন পরম নিশ্চিন্ত মনেই ধূমপান করছিল। ভূতির যে মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছে বুঝতে তার এতটুকু অসুবিধে হল না। প্রসঙ্গটা চট করে পালটিয়ে নিল সে। নিজের মাথাটা ডালের ফাঁক দিয়ে অনেকখানি নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, হ্যাঁরা বেগুন সেঁকছিস। কাঁচালংকা আর পেঁয়াজ আছে তো?

ভূতির মেজাজটা হঠাৎই আবার পালটে গেল। তার চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে উঠল। জিবে ঝোল টেনে বললে, সে আর বলতে। সব মজুত। এখন শুধু……

ভূতিকে নরম হতে দেখে, কিম ভূতের একটু সাহস হল। হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলল, ভাগ দিবিতো নাকি একাই খাবি?

প্রশ্ন শুনে সে কিন্তু মোটেই খুশী হল না। বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বললে, তোকে ভাগ না দিয়ে আমি কি এতকাল কিছু খাই না খেয়েছি?

সে হাসতে হাসতে বললে, না ঠাট্টা করে দেখলাম তুই কি বলিস!

পেঁয়াজ আর কাঁচালংকাকুচো ছড়ান বেগুন সেঁকাটা একটা পোড়া মালসায় নিয়ে বসেছিল ভূতি! বর্ষার দিন বলেই হয়ত সেদিন খেতে খুবই ভালো লাগছিল। চোখ বুজিয়ে খেতে খেতে এতই বিভোর হয়ে পড়ল, তার একেবারেই খেয়াল রইল না ভূতকে এ থেকে ভাগ দিতে হবে।

খেতে খেতে তা প্রায় বারো আনাই সাবাড়। হঠাৎ কিম ভূতের নাকে একটা বিটকেল শব্দ শুনে, সে খাওয়া থামাল। কিম ভূতকে ডেকে বললে নেমে আয়। তোর জন্যে বোঁটার দিকটা রেখেছি।

তুই তো বেগুনের বোঁটা চুষতে বেশী ভালোবাসিস।

কিম ভূত শুনে কিন্তু মোটেই খুশী হল না। কিন্তু কিছু বলারও উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত হয়ত কপালে বোঁটাও জুটবে না। তাছাড়া ভূতির খ্যাঁকখ্যাঁকানি তো আছেই।

অগত্যা বেগুনের বোঁটাটা নিয়েই সে পলিপপের মত চুষে চুষে খেতে লাগল। ভূতির তা লক্ষ্য এড়ায়নি। বললে, কেমন লাগছে বললি না—

তা মন্দ কি। তবে বড্ড পুড়িয়ে ফেলেছিস। রঙটা প্রায় আমাদের গায়েব মতই হয়ে গিয়েছে।

—কেন, আমাদের গায়ের রঙ মন্দ নাকি?

—না মন্দ হতে যাবে কেন। কথাতেই আছে কালো জগতের আলো। তবে মানুষেরা নিন্দে করে। দেখিস না কথায় কথায় বলে কেলে ভূত!

কথাটা শুনে ভূতি কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল। নিজের হাতপাগুলো চোখের সামনে ঘোরাতে ফেরাতে বলল, মানুষ ঠিকই বলেরে। আমাদের গায়েব রঙ পোড়া কাঠের মতই। কেন যে এমন হল। কালে সব কিছুই পালটে যাবে আমরাই কেবল পালটাব না।

ইস্ ফর্সা হবার যদি কোনও উপায় থাকত—

ভূতিকে আক্ষেপ করতে দেখে কিম ভূত ফ্যাঁক্ ফ্যাঁক্ করে হেসে উঠল।

—কিরে হাসছিস যে বড়!

—না হেসে পারলাম না। তুই বোধহয় জানিস না আমরাও এককালে ফর্সাই ছিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে কালো হয়ে গিয়েছি।

সত্যি বলছিস? ভূতি গা ঘেঁসে বসল কিমভূতের। বললে, আজ তো আর বেরোবি না। গল্পটাই বল না শুনি। তাতেও তো কিছুটা স্বস্তি পাব।

কিম ভূত বেগুনের বোঁটা চুষতে চুষতে বললে, বলছিস। আমার কোনও আপত্তি নেই। শোন তাহলে বলি।

সে অনেক কাল আগের কথা। তখন আমাদের এরকম তালপাতার সেপাইয়ের মত চেহারা ছিলনা। গায়ের রঙ ছিল দুধের মত সাদা ধবধবে। পেটটা ছিল জালার মত বড়। আর পিছনে এক ফুট থেকে দেড়ফুটের মত একটা লেজ ছিল।

মানুষের জনক-জননী আদম আর ইভ মরেই ভূত-পেতনী রূপে আবির্ভূত হয়েছিল এই পৃথিবীতে। ভূতের নামকরণ হয়েছিল ভট আর পেতনী হয়েছিল ভটি।

ভট আর ভটি নির্জন জঙ্গলে দীর্ঘদিন বসবাস করার পর হাঁপিয়ে উঠল। স্বজাতীয় ভূতের খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়ল পৃথিবী ভ্রমণে।

ঘুরতে ঘুরতে তারা পোঁছে গেল শেষ পর্যন্ত আফ্রিকায়। আফ্রিকায় তখন এত জনপদ গড়ে ওঠেনি। খালি জঙ্গল আর জঙ্গল। আর হিংস্র

জীবজন্তুর অবাধ বিচরণ।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে ওরা দিকভ্রমে ঘুরপাক খেতে লাগল। কোনও পথঘাট না থাকার জন্য ইচ্ছেমত বেরিয়ে আসারও কোনও সুযোগ পাচ্ছিল না। গাছের ফলমূল খেয়ে তাদের দিন কাটতে লাগল।

এইভাবে দীর্ঘ কয়েকশো বছর কেটে গেল।

অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ তারাও কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ভটি বলল, ভট আর পারিনে। আয় আমরা দুদণ্ড কোথায়ও বিশ্রাম নিই।

অন্ধকারে সবকিছু দেখা যায় না। হাতড়াতে হাতড়াতে হাতের নাগালে যে তেঁতুল গাছটা পেল তার ওপরেই ওরা বাসা বাঁধল এবং কীভাবে এই বিপদ থেকে রেহাই পেতে পারে সেই কথাই দুজনে চিন্তা করতে লাগল।

একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

ভট আর ভটি লক্ষ্য করল, যে গাছটায় তারা বাসা বেঁধেছে, সেটা ধীর গতিতে পা-পা চলতে শুরু করেছে।

ভটিই বেশী ভয় পেল। ভটের হাত ধরে বললে, গাছকে চলতে কখনও তো দেখিনি। কী ব্যাপার বলত, কারুর কোনও বদ মতলব-ফতলব নেইতো আমাদের বিব্রত করার?

ভট নীরব থাকলেও বিশেষ ঘাবড়ায় নি। ভটির গায়ে একটা চিমটি কেটে বললে, চুপ কর অত বক্‌বক্‌ করিস নি।

এই জমাট অন্ধকারে কিছু কি দেখতে পাচ্ছি ছাই! সব কিছুই তো আন্দাজে-আন্দাজে করা হচ্ছে। এখন গাছের যদি পা গজিয়ে থাকে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু তা যদি না গজায়, তাহলে অবিশ্যি ভাবনার কথাই বটে!

তবে কী আর করবে। বড়জোর মাটিতে ফেলে দেবে তার বেশী আর কি করতে পারবে? বেগতিক দেখলে তার আগেই আমরা মাটিতে নেমে পড়ব।

ভট সাহস যোগাতে ভটি নিশ্চিন্ত হল।

দেখতে দেখতে কয়েক হাজার বছর কেটে গেল। ওদের গাছ কিন্তু যথারীতি পা-পা করেই চলছিল।

হঠাৎ একদিনে ওরা দুজনে যখন পরস্পরের পিঠে হেলান দিয়ে বসে চোখ পিট পিট করছে, গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে, সাদা কাপড়ের মত চিক্‌চিক্‌ করছিল কিছু একটা অন্ধকারেতে।

ভটি একটু ঘাবড়িয়েই গিয়েছিল। ভট কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বললে, আরেঃ এযে দেখছি সূর্যরশ্মি! তবে কি আমরা জঙ্গলের প্রান্তে এসে পৌঁছেচি!

সেও কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করল। ভটের কথায় সায় দিয়ে বললে, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছিস। ওরা সূর্যের আলো ছাড়া আর কিইবা হতে পারে।

দুজনে আনন্দে হাত তুলে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ আনন্দ করার পর ভটি বলল, তাতো হল কিন্তু যে গাছের মাথায় চড়ে আমরা দুর্গম জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছলাম, তার গতি রহস্য তো উদ্ঘাটন হল না!

এমনও হতে পারে গাছটা আমাদের কোনও হত্যাপুরীতে নিয়ে চলেছে।

ভট বলল তা বটে। আমরা এত বনজঙ্গল ঘুরলাম কিন্তু গাছকে চলতে তো কোথায়ও দেখিনি। অবিরাম হেঁটে চলেছে যখন একটা কিছু উদ্দেশ্য কি আর না আছে!

নাঃ চুপ করে আর বসে থাকা যায় না। দাঁড়া একবার নেমেই দেখি ব্যাপারটা। তুই আর নামিস নি।

তার এই দুঃসাহস দেখানোটা কিন্তু ভটির একেবারেই পছন্দ হল না। সেখানে নানা জন্তু-জানোয়ার আছে, খানাখন্দ আছে কোথায় কখন কী বিপদে পড়ে তার ঠিক নেই।

সেও কিছু চেনে না। জানে না। কোথায় যাবে। তাকে সাবধান করে দিয়ে বললে, বিপদে পড়লে জোরে শিস দিবি। আমি জানতে পারব তোর বিপদের কথা!

সে কোনও জবাব না দিলেও ঘাড় নাড়ল। দীর্ঘকাল গাছের মগডালে বসে হাত পা তেমন সতেজ ছিল না। তাই হাত পা ছুঁড়ে দেহকে সচল করে তুলতে লাগল।

নিচে নেমে সে সর্বপ্রথম যেখানে পা রাখল, জায়গাটা মোটেই মসৃণ নয়। কেমন যেন খসখসে উঁচু-নিচু। এবং তার পরিধিও কয়েক ফুটের মত।

গাছটা ঠিক তার মধ্যিখান থেকেই বেরিয়েছে।

সমতল মাটির সন্ধানে সে এদিক সেদিক দেখতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতেই হঠাৎ চোখে পড়ল, গাছের গুঁড়ির তলা থেকে একটা লম্বাটে মুখ গলা বাড়িয়ে তাকে দেখছে।

এমন ঘটনা অপ্রত্যাশিতই বটে। গাছের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে কিছুতেই তার মাথায় এল না।

অনেকক্ষণ গভীরভাবে নিরীক্ষণ করার পর বুঝতে পারল সেটা একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল। বুকের মধ্যে ধুকপুক করতে লাগল।

কচ্ছপটা এতক্ষণ কটমট করে তাকিয়েছিল। হঠাৎ সে মোলায়েম স্বরে বলল, তোর স্পর্ধা তো কম নয়। আমার পিঠে চড়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিস। জানিস আমি কে?

সে মাথা নেড়ে বলল কি করে জানব। আমরা যেখান থেকে এসেছি
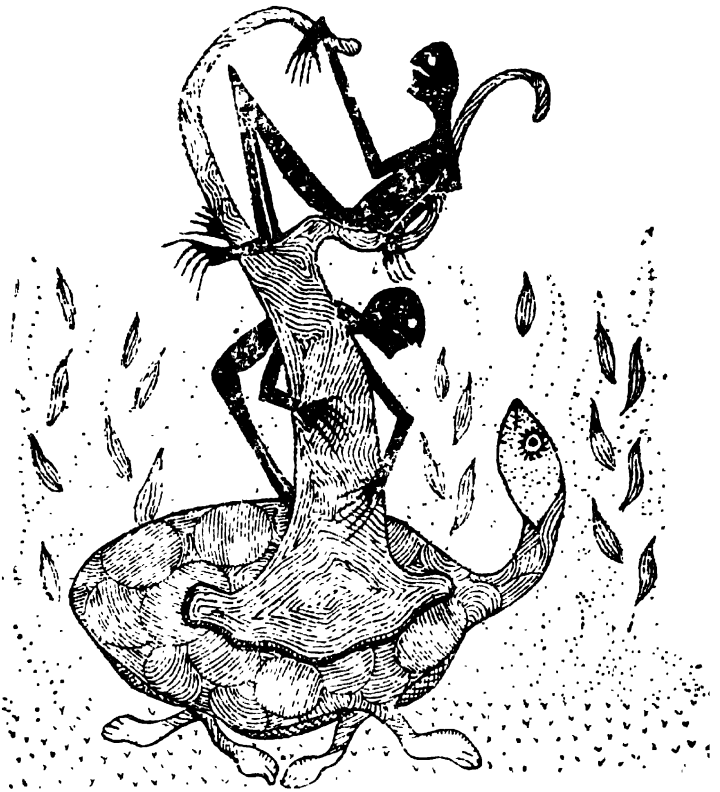
এক লম্বাটে মুখ গলা বাড়িয়ে তাকে দেখছে।

সেখানে জন্তু জানোয়ার কিছুই ছিল না। তবে গল্প শুনেছি বটে।

কচ্ছপ ঘাড় নেড়ে বললে, এই প্রথম তাহলে চোখে দেখলি আমাকে। আফ্রিকার জঙ্গলে যত জন্তু জানোয়ার আছে আমি সকলেরই গুরু। কয়েক কোটি বছর ধরে আমরা বংশানুক্রমে এই জঙ্গলে বাস করছি।

সে যাই হোক তোর স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। জানিস এর পরিণাম কি ঘটতে পারে।

ভট দেখল অবস্থা সুবিধের নয়। এখনও তারা বিপদমুক্ত হয়নি। গলার স্বর নামিয়ে সবিনয়ে বলল, না জেনে উঠে পড়েছি।

অন্যায় হয়ে থাকলে নিজগুণে ক্ষমা কর।

তার কথা শুনে কচ্ছপ খুবই খুশী হল। বললে, তোরা কী পেলে খুশী হবি?

সে বলল, আমরা এই জঙ্গলে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছি। বেরুতে পাচ্ছি না। যদি বার করে দাও তো খুব উপকার হয়।

কচ্ছপ বললে, এ আর এমনি কি। জঙ্গলের সীমানায় তো এসে পেঁৗছেই গিয়েছি। তোরা গাছের মাথায় উঠে বসে থাকগে। এই গাছটা আমি ইচ্ছে করেই পিঠে পুষেছি। রোদ বৃষ্টি থেকে দেহ বাঁচানোর জন্য।

ভট আর কথা বাড়াল না। প্রসন্ন চিত্তেই গাছের মাথায় উঠে গেল।

জঙ্গল থেকে বেরুনো যত সোজা মনে হচ্ছিল তত সোজা হল না। তাও দেখতে দেখতে প্রায় একশো বছর কেটে গেল।

যেদিন কচ্ছপ বনের বাইরে পা দিল, সূর্য তখন মধ্য গগনে বিরাজমান।

ভট-ভটি তর্ তর্ করে গাছ থেকে নেমে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ঠুকল কচ্ছপকে। কচ্ছপ খুশী হল বটে কিন্তু তাদের স্বরূপ দেখে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এদিকে দীর্ঘকাল অন্ধকারে থেকে, সূর্যের আলোয় দুজনেরই কষ্ট হচ্ছিল। দুহাত দূরের জিনিষও ঝাপসা লাগছিল তাদের চোখে।

ক্রমশ তাদের দৃষ্টিশক্তি স্বচ্ছ হতে লাগল।

ভট বললে, হ্যারা ভটি তোর একি ছিরি হয়েছে। লেজ খসে গিয়েছে, ভুঁড়ি চিমসে হয়ে গিয়েছে আর গায়ের রঙ তো আলকাতরার চেয়েও কালো।

ভটি তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে বললে, ঠিক বলেছিস তো। এত পরিবর্তন হয়েছে ঘূণাক্ষরেও টের পাইনি। কী হবে! তারপর হঠাৎই চীৎকার করে উঠে বললে, তোরও তো একই দশা।

ভট সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেহারা দেখে মাথা চাপড়াতে লাগল।

মনের দুঃখে ওরা আবার বেরিয়ে পড়ল পৃথিবী ভ্রমণে। এ রাজ্য সে রাজ্য, এদেশ সে দেশ ঘুরতে ঘুরতে তারা মিশরে পেঁৗছল।

মিশরে ভটির যে ছেলে হল, তার দেহে আর রূপবান ভূতের কোনও চিহ্নই নেই। যেমন শুটকো তেমনই কালো।

ওরা ভাবল পরেরটা যদি ফুটফুটে সুন্দর হয়। হল না। ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

তারপর আর কি! ভট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

ভটি বেশ হতাশ হয়েই প্রশ্ন করল, বনের মধ্যে তাদের গায়ের রঙ কি করে পালটে গেল সেসব তো কিছু বললি না!

ভট বললে, কি করে আর অরণ্যের অন্ধকার গায়ে লেগে লেগে সর্বাঙ্গে ধীরে ধীরে কালো ছাপ পড়ে গেল। এই ছোপ আর ওঠার নয় এমন কি গায়ের ছাল তুলে ফেললেও।

শুনে ভটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

ইলিশমাছ

কদিন ধরেই ভয়ংকর গরম পড়েছিল। তারপরেই হঠাৎ এই বৃষ্টি।

বৃষ্টিতে ভেজা কিম ভূতের একেবারেই সহ্য হয় না। বৃষ্টি শুরু হতে সে মনের আনন্দে কিছুক্ষণ ভিজেছিল। তার পরিণাম ভাল হয়নি। এখনও তার জের চলেছে।

গায়ে হাত-পায়ে ব্যথা নিয়েই সে ঘাপটি মেরে বসেছিল গাছের মগডালেতে। লাফালাফি ঝাপাঝাপিতে আজ একদম উৎসাহ নেই।

ভূতি পাশে চোখ বুজিয়ে বসে, অন্যমনস্ক হয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল কট-কট করে। কোনও কাজ না থাকলে সে নখ কেটে সময় কাটায়।

হঠাৎই কিম ভূত সরব হল। বললে, এমন বর্ষার দিনে মানুষের প্রিয় খাদ্য কি বলতে পারিস?

ভূতি একটু অন্যমনস্ক থাকার জন্যই উত্তরটার ওপর তেমন গুরুত্ব দিল না। বললে, ওরা কত কি খায়। তোর এখন কোনটা মনে পড়েছে কে জানে!

সে ভূতির মুখের দিকে একমিনিট তাকিয়ে থেকে বললে, জেনে রাখ গরম গরম খিচুড়ি!

ভূতি আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ইলিশমাছ ভাজা সহ সেটাতো বললি না—

ইলিশমাছের নাম শোনা মাত্র সে জিবে স-র-র-র করে আওয়াজ করে বললে, ইস্ কতকাল খাইনি। ছেলেবেলায় আমি প্রতিদিন ইলিশ না পেলে খেতেই বসতাম না।

ভূতি মুচকি হাসল। তা এতই যখন তোর লোভ ইলিশে আনলেই পারিস। টক-ঝাল রেঁধে দিই।

দিবি? চকচক করে উঠল কিম ভূতের চোখ দুটো। আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াল গাছের ওপর।

ভূতি বললে, তাতো বুঝলাম। কিন্তু মাছের যা আকাল ইলিশমাছ যোগাড় করতে পারবিত?

এবার সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বুক চিতিয়ে, দুম দুম করে কটা ঘুষি মেরে বললে, তার মানে? তুই আমায় ভাবিস কি বলত? জানিস আমি যদি ইচ্ছে করি এখানে ইলিশমাছের পাহাড় বানিয়ে দিতে পারি। আমার অসাধ্য কিছু নেই।

ভূতি মুচকি হাসছিল। সে থামতে বললে, গপ্প শুনে আর করব কি? তুই ছেলেবেলায় কি খেতিস না খেতিস সে সব শুনে আর কী হবে। তার চেয়ে এই মুহূর্তে এখন যদি একটা গঙ্গার ইলিশ নিয়ে এসে খাওয়াতে পারতিস, তাহলে নয় বুঝতাম। কিম ভূতের আর তর্ সইল না। তালপাতার চটিটা পায়ে গলিয়ে ফটাস্ ফটাস্ করে শব্দ তুলে গাছ থেকে নেমে গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। বলে গেল তাওয়া গরম কর।

গঙ্গার ঘাটের দূরত্ব সেখান থেকে বেশী নয়। তা মাইল ছয়েক হবে। কিম ভূত লম্বা লম্বা পা ফেলে সেদিকে অগ্রসর হল।

গঙ্গার ঘাট দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল। সারবেঁধে নৌকা বাঁধা রয়েছে কূলেতে। তাছাড়াও একটা ছোটখাট জটলা।

সকলেই জলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ছেলেবেলায় যখন সে নিয়মিত গঙ্গার ঘাটে ঘোরাফেরা করত, তখন মানুষ দেখলেও এরকম ভীড় দেখা যেতনা।

ক্রেতার তুলনায় তখন মাছের সংখ্যা থাকত বেশী। সবাই মনের মত মাছটা নিয়ে যেত। বাকি চলে যেত সব বাজারে।

ভীড় দেখে কিম ভূত এবার একটু ঘাবড়িয়েই গেল। নিজেকে গাছের আড়াল করতে করতে সে পেঁছিল গঙ্গার ঘাটে এবং জনতার মতিগতি লক্ষ্য করতে লাগল।

ওদিকে একটা জেলে নৌকা নিয়ে পাড়ে পেঁছনো মাত্রই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল ঘণ্টা খানেক ধরে। চীৎকার চেঁচামেচিতে মুখর হয়ে উঠল নির্জন গঙ্গার ঘাট। পাঁচটা ইলিশ ক্রেতা পঞ্চান্ন জন!

ওই পাঁচটা ইলিশ যে পাঁচজন হাতিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল, তারা আলেক-জান্ডারের চেয়ে কোনও অংশেই কম বীর নয়।

তাদের ভাবসাব দেখে তো কিম ভূতের চক্ষু ছানাবড়া। এভাবে ইলিশমাছ সংগ্রহ করবে সে কী করে? কিন্তু না করে উপায় কি?

ভূতিকে আজ সে যে সব কথা শুনিয়ে এসেছে তারপর না নিয়ে খালি হাতে বাসায় ফিরবেই বা কোন মুখে।

ভাবতে ভাবতে তেতে উঠতে লাগল কিমভূত। পা থেকে মাথা ছুঁয়ে থামল সেই উত্তেজনা।

এরপর সে এগিয়ে গেল গুটিগুটি। এক গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগল পরের ক্ষেপের জন্য।

আবার কটা ইলিশ উঠেছে জেলেদের জালে। পাড়ে পেঁছনো মাত্রই আবার সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কিম ভূতও এবার তৈরী ছিল। বিলম্ব না করে সেও ঝাঁপাল।

কিন্তু মানুষের গোদা শরীরের ধাক্কা সামলানো কি সোজা ব্যাপার। তার বাতাসের মত হালকা শরীর চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। শুধু কি তাই, পাশের লোকটা বুটজুতো দিয়ে এমনভাবে তার পাটা মাড়িয়ে দিল—সে চীৎকার করে উঠলেও তা কারুর কানেই গেল না।

এবার তার জিদ আরও বেড়ে গেল। ইলিশ তার চাই-ই। এত কষ্ট সহ্য করেছে যখন, শূন্য হাতে সে কিছুতেই ফিরবে না। হঠাৎ কে একজন কনুই চালাল! লাগল তার মাথায় ঠক্ করে।

হাত দিয়ে সে মাথা স্পর্শ করল। ঝন্ ঝন্ করে মাথাটা।

ইতিমধ্যে একজন বেরিয়ে এল সেই ভীড় ঠেলে। হাতে একটা চকচকে রুপোলী ইলিশ। কম করেও ওজন দেড়কিলো তো হবেই।

মাছটা দেখেই কিম ভূতের জিব সড়-সড় করে উঠল। ঠিক এইরকম ইলিশই সেও খেত ছেলেবেলায়।

ওই মাছটার ওপর তার নজর পড়ল। কিভাবে ওই ইলিশ মাছটা তার কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া যায় সেই কথাই পাক খেতে লাগল তার মাথায়।

বুদ্ধি আর কিছুতেই খোলে না। কি করি কি করি হঠাৎই খুলে গেল তার বুদ্ধিটা।

লোকটা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে।

সে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ছুটল তার পিছু পিছু। সে যখন প্রায় তার নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে ঠিক সেই মুহূর্তেই সে ঢুকে পড়ল একটা বাড়ীর মধ্যে।

সে আর কি করে, তাদের বাড়ীর সিঁড়ির তলায় অন্ধকারে আশ্রয় নিল।

সে যে বাড়ীর কর্তা তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। বাড়ীর সবাই ইলিশ দেখে খুশীতে হৈ হৈ করে উঠল।

কর্তা বলল একেবারে টাটকা। দেরী করে অযথা লাভ নেই। এখুনি কেটে ভাজ। গরম গরম খাই।

কর্তার নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গেই পালিত হল। কড়া চাপাল উনুনে। এবার কে কখানা ভাজা খাবে তা নিয়ে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল বাড়ীর লোকেদের মধ্যে।

আর তর সইল না কিম ভূতের। কর্তামশাই ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়েছিল। কিম ভূত পা টিপে টিপে তার ঘাড়ে চেপে বসল।

গরম ইলিশ মাছ খাবার স্বপ্নে কর্তামশাই যখন বিভোর, হঠাৎ কাঁধটা তার মচ্মচ্ করে উঠল। কর্তামশাই ভয় পেয়ে উঠে পড়ল চেয়ার থেকে।

কর্তামশাইয়ের শরীর ভাল নয়। ছেলেরা ছুটল ডাক্তার ডাকতে।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা শুরু করল। সন্দেহ করল একটা কিছু হয়েছে। কিছুই মিলল না।

এদিকে ভাজা ইলিশের গন্ধে বাড়ী ম'ম করছে।

ডাক্তার-বদ্যি সকলেই নিরাশ করতে ডাক পড়ল ওঝার। সে দেখেশুনে বলল, মাথা চালছে যেরকম মনে হচ্ছে ভূতেই ধরেছে।

ওঝা কাঁধে চিমটি কাটল। তিন চিমটিতেই ভূত ক্যাচ। ওঝা বলল, হুম বেশ ভারী ভূতই ভর করেছে। কমপক্ষে সাতমণ সরষে পোড়াতেই হবে। তবে যদি ভূত নামে!

বাড়ীর কর্তা বলে কথা। সাতবস্তা সরষে এল। শুরু হল হোম আর যাগ-যজ্ঞ।

সরষে পোড়ার সাথে সাথে ওঝায় ঝাঁটা নাচাতে লাগল তার মুখের সামনে। ওঝা বলল, পোড়ার মুখো তুই আর ঘাড়ে চড়ার লোক পাসনি? বল কি চাস? কী পেলে তুই কর্তামশাইকে রেহাই দিবি?

কোনও সাড়া নেই।

ওঝা বললে, কিরে সাড়া দিচ্ছিস না কেন? আমি কান ঠেকাচ্ছি। যা বলবার কানে চুপিচুপি বলে দে।

এইবারে ওঝার অনুরোধে কাজ হল। প্রথমে হিস্-হিস্ করে একটা শব্দ হল। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলার শব্দ। ইলিশ মাছটায় আমার নজর পড়েছে। এই মাছটাই আমার চাই!

ওঝা সঙ্গে সঙ্গেই জানাল সে কথা তার বাড়ীর গিন্নিকে।

গিন্নি শুনে বলল, এক্ষুনি এক্ষুনি। তুমি তাকে ঘাড় থেকে নামতে বল আমি ভাজা মাছ কলাপাতায় মুড়ে টিলের ছাদে রেখে আসছি। ওখান থেকেই যেন নিয়ে যায়।

ওঝা সেকথা বলতে কিমভূত নেমে পড়ল কর্তার ঘাড় থেকে। ঘরের মুখেই ছাদে যাবার সিঁড়ি। টিলের ছাদে ওঠার পথে জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই সে অবাক। ইলিশমাছের বড় বড় দাগাগুলো সবই কড়ার গরম তেলের মধ্যে চিটপিট করছে। কেবল লেজা মুড়ো ইত্যাদি কাঁটাসার অংশগুলো সেখানে নেই।

কিম ভূতের বুঝতে বাকি রইল না গিন্নির চালাকিখানা। কাঁটামাটা-গুলোই তার জন্যে রেখে এসেছে ছাদের ঘরে। তাকে বোকা বানিয়েই কাজ সারতে চায়। খুবই মাথা গরম হয়ে গেল কিম ভূতের। এর জবাব সে দেবে। এবার সে চাপল সোজা গিয়ে গিন্নিমার ঘাড়ে।

গিন্নিমা সবে একটা গরম ইলিশমাছভাজায় কামড় বসাতে যাবে হঠাৎই আবার বিপত্তি। মচমচ করে উঠল এবার তার কাঁধ দুটো। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে সে কি দপদপানি!

প্রথম প্রথম সে এটাও যে ভৌতিক কাণ্ড বুঝতে পারেনি। হাড় মড়মড়ানি ব্যারাম ভেবে টপাটপ কটা বড়ি গিলে ফেলল।

কিন্তু বড়ি খেয়ে কি আর সে ব্যথা যায়। কাঁধে মচমচানি বাড়ে।

ওঝা তখন বাইরে অপেক্ষা করছিল।

সন্দেহক্রমে এবারে গিন্নিকেও দেখানো হল তাকে। গিন্নির মুখের ওপর চোখ বুলিয়েই বলল, সে ভূত এখনও বাড়ী থেকে বিদেয় হয়নি।

নিশ্চয়ই কোনও ত্রুটি হয়েছে। আর তাই সে বদলা নিয়েছে।

খোঁজ খোঁজ রব উঠল। ত্রুটিটা কি কারুরই মাথায় আসে না।

অনেক পরে তা ধরা পড়ল। ইলিশমাছের ভাগেতেই গণ্ডগোল।

গিন্নিমার নির্দেশ মতই মাছ বদলে দেওয়া হল। মাছের দাগা গেল ওপরের ছাদে কাঁটা এল নীচে নেমে।

এবার ওঝা ভূতের উদ্দেশে বলল, যা হবার হয়ে গিয়েছে। আর ত্রুটি নিসনি। ইলিশমাছ চিলের ছাদেই রাখা আছে। গিন্নিমাকে এযাত্রা রেহাই দে বাপ্।

এবার সে গিন্নিমাকে ছেড়ে নিঃশব্দে বড় বড় পা ফেলে উঠল ছাদে। ছাদে উঠে দেখল ওঝা মিথ্যে বলেনি। দাগাগুলো থেকে ভর-ভর করে গন্ধ বেরুচ্ছে।

আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না কিম ভূত। যা চাইছিল তাই সে পেয়েছে। সেগুলো বগলদাবা করেই ফিরে এল বাসাতে।

এদিকে ভূতি দীর্ঘসময় অপেক্ষা করেও যখন কিম ভূতের সাড়াশব্দ পেল না, সে হতাশ হয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিল। হঠাৎ খস্-খস্ করে গাছে ওঠার শব্দ পেয়ে সে উঠে বসল।

গন্ধটা চিনতে তার একটুও অসুবিধা হল না। এ গন্ধ একমাইল দূরে থেকেই সে টের পায়।

কিম ভূত মুখে কিছুই প্রকাশ করল না। প্রথমে এমন ভাব দেখাল যেন কপালে কিছুই জোটে নি। পা ঘসে-ঘসে সে ভূতির সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, কিছু মনে করিস নি। কথা রাখতে পারলাম না।

ভূতি বুঝল সে নাটক করছে। একটু মুচকি হেসে বললে, ছেনালি থাক্। এখন তাড়াতাড়ি বার কর্ দেখি খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছে।

সে দেখল আর লুকিয়ে লাভ নেই। ভূতি ধরে ফেলেছে।

পুঁটলিটা সে ধরে দিল ভূতির সামনে। বললে, দেখ্ কি এনেছি। সে বয়সে খাবি সেই বয়সেই থাকবি।

সেটা দেখে ভূতি একটু অবাকই হল। এত যত্ন করে কে আবার মাছ ভেজে বেঁধে দিল তাকে?

সে কোনও প্রশ্ন করার আগেই কিম ভূতের ঠোঁট নড়ে উঠল। বললে, ইলিশ মাছের ধান্দায় গঙ্গার ধারে গিয়েছি। কতক্ষণ আর লুকিয়ে থাকব?

চেনাশোনা কজন মাঝির সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্রই তারা তো সাষ্টাঙ্গে গড় করল প্রথমে। তারপর করজোড়ে প্রশ্ন করল কতদিন পরে এসেছেন। কী

মাছ দেব আপনাকে ?

ইলিশের 'ই' উচ্চারণ করার সাথে সাথেই জেলেরা ছুটল।

আমি আর কি করি। এদিক সেদিক তাকাচ্ছি হঠাৎ দেখি এই ইলিশটা নিয়ে হাজির তারা। আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, এইমাত্র ধরে, কেটে, ভেজে নিয়ে এলাম।

এজন্য আমরা গর্ব অনুভব করছি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার তোর কথা মনে পড়ে গেল। ভাগ্য যাহোক্। মেঘ না চাইতেই জল। পুঁটুলি খুলে কিম ভূত মেলে ধরল ভূতির মুখের সামনে। তখনও কলকল করে তেল ঝরছে ইলিশের গা থেকে।

ভূতির আর ধৈর্য কুলালো না। খপ্ করে গরম গোটা কয়েক ইলিশ মাছের দাগা তুলে নিয়ে, গবগব করে খেতে শুরু করে দিল।

খেতে খেতেই বললে, সত্যিই তোর কি অসাধারণ ক্ষমতা!

স্বপ্ন

অন্যাদিন কিম ভূত ঘুরে ঘুরে এসে গাছে উঠতে উঠতে বলে, ভূতি শিগ্‌গীর খেতে দে কিছু। পেট চুঁই-চুঁই করছে। সেদিন কিন্তু তারব্যতিক্রম ঘটল।

সে তো খেতে চাইলইনা উপরন্তু পরমানন্দে গাছের ডাল ধরে ডিগবাজী খেতে লাগল।

ভূতি মগডালে বসে ঝিমোচ্ছিল। হাতের কাজকর্ম তার অনেক আগেই সারা হয়ে গিয়েছে। বেলতলা থেকে খাঁদুর আসার কথা ছিল। তারজন্যেই অপেক্ষা করে করে তার ঝিমোনি এসে গিয়েছিল।

হঠাৎ থর-থর করে গাছটা কেঁপে উঠতেই তার ঝিমোনি ছুটে গেল। নীচের দিকে তাকিয়ে কিম ভূতকে গাছের ডাল ধরে দুলতে দেখে বললে, ব্যাপারটা কি! তোর মাথার ইস্ক্রুপগুলো কি ঢিলে হয়ে গিয়েছে? কিছু খেলিনা দেলিনা এসেই দুলতে শুরু করলি যে বড়!

কিম ভূত মুখ তুলে দেখল বটে কিন্তু কোনওরকম উচ্চবাচ্চ করল না। নীরবেই ডাল ধরে দুলতে লাগল। তবে বেশীক্ষণ নয়। দোল খাওয়া থামিয়ে হঠাৎ মগডালে উঠে তার পাশে বসে বললে, একটা গুথ নুজ।

এ শব্দ ভূতের মুখে সে কোনওদিনই শোনেনি। স্বভাবতই কিছুটা বিস্মিত হয়ে বললে, গালাগাল দিচ্ছিস যে বড়—

কিম ভূত তো হি-হি করে হেসেই অস্থির। ধ্যুৎ, গালাগাল দিতে যাব কেন। তোর সঙ্গে তো আমার কোনরকম ঝগড়াঝাটি হয়নি—

ভূতি কিন্তু সেকথা শুনেও বিশেষ খুশী হলো না। বললে, গালাগাল ছাড়া কি। এ কথা তো তোর মুখে আগে কখনও শুনিনি।

কিম ভূত অবশ্য ইচ্ছে করেই কথাটা চাপছিল। ভূতিকে অধৈর্য হতে দেখে একগাল হেসে বললে, এর নাম ইনজিরি। আজ শিখেছি। গুথ মানে ভাল আর নুজ মানে খবর। এককথায় ভাল খবর।

'স-অ-অ-ত্যি-ই-ই' বলে ভূতি তার হাত দুটো জাপটে ধরল। গলার স্বরটা হঠাৎ অনেক নীচে নামিয়ে এনে বললে, এখন খবরটা কি শুনি।

কিম ভূত পায়ের ওপর পা চাপিয়ে বসল। জোড়া পা একসাথে নাচাতে নাচাতে বললে, মেসোপটেমিয়ায় একটা এঁদো পানা পুকুরের তলায় একটা গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি।

ছাপান্ন রাজার ধন একশ ঘড়া হীরে-মুক্তো-মণি আছে ঘড়ার মধ্যে। আমি

ছাড়া এর সন্ধান আর কেউ জানে না। বুঝতেই পারছিস এখন আমাদের ভবিষ্যৎ কি!

ভূতি এতক্ষণ হাঁ করেই তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে। খবরটা আদৌ সত্যি কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

কিম ভূতের মাঝে মাঝে এরকম গুলমারার অভ্যেস আছে। তারই পুনরাবৃত্তি কিনা কে বলতে পারে।

তবে এ ধরণের গুল ইতিপূর্বে সে কখনও মারেনি।

তবুও সন্দেহ নিরসনের জন্য সে বলল, দ্যাখ বানাচ্ছিস নাতো? তোর তো আ-বা-র মাঝে মাঝে সে চিন্তা চেপে ওঠে।

সে গম্ভীর হয়ে বললে, মা কালী!

ভূতি খাবারের থালাখানা তার হাতে তুলে দিয়ে বললে, এবারে খুলে বলতো ব্যাপারখানা কি।

সে খেতে খেতে বললে, আজ চরতে বেরিয়ে যখন একটা গাছে বসে বেল খাচ্ছিলাম দুটো পাখী মগডালে বসে এই গুপ্তধন নিয়ে আলোচনা করছিল। ওদের অজান্তে আমি সব শুনে নিয়েছি। ছাপ্পান্ন রাজার ধন একত্রে লুকানো আছে সেখানে। সোজা কথা নয়!

ভূতির অবিশ্বাস কিছুটা কেটে গেল। সে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললে, হ্যাঁরে হীরে-মুক্তো-মণি কী জিনিষ র‍্যা?

কিম ভূত একটু বিব্রতই হল। কি দেখিয়ে বোঝাবে সে। অনেক ভেবে-ভেবে বললে, খুব দামী জিনিষ। মানুষে ব্যবহার করে, বেচলে বহুটাকা পাওয়া যাবে।

টাকার নামে ভূতির মাড়ি বেরিয়ে পড়ল। এই টাকার অভাবের জন্যই তাদের এই দুর্দশা। খুশীতে গদ-গদ হয়ে প্রশ্ন করল, তা কত টাকা পাব একটু হিসেব করেই বলনা—

—ধ্যুৎ, মুখে মুখে অত হিসেব করা যায় নাকি? আমাদের মাথা অত পরিষ্কার নয়।

তার মুখের কথা শেষ হওয়া মাত্রই ভূতি লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড় দিল। কোত্থেকে একটা ভাঙ্গা কলসী আর কাঠ কয়লার টুকরো এনে কিম ভূতের হাতে দিয়ে বললে, নে হিসেব কর—

তার ইচ্ছে না থাকলেও হিসেব-নিকেশে বসতে হল। বেশ কিছু গোল্লা কেটে গম্ভীর হয়ে বললে, তা পঁচাত্তর কোটি টাকা আর খুচরো দশ পয়সার মত পাব।

স-ত্যি! ভূতি আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল। সময় মত কিম ভূত ধরে ফেলতে কোনরকমে রক্ষা পেল পতনের হাত থেকে!

কোটিপতি হবার আনন্দে দুজনে ঢকঢক করে একপেট ঠাণ্ডা জল খেয়ে

ফেলল। সশব্দে ঢেকুর উঠল দুজনের দুখানা। ভূতি বটপাতা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে, অত টাকা কোথায় রাখবি ঠিক করেছিস?

কিম ভূতের চিন্তা অতখানি এগোয়নি। আকস্মিক এই প্রশ্ন শুনে সে কিছুটা বিব্রতই হল। তবে ভূতি বলেই হয়ত আর গভীরে সে গেল না। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, মাটির তলায়। আমাদের তো আর সিন্দুক-টিন্দুক নেই।

মাটির তলায় টাকা রাখার প্রস্তাবটা খুব একটা মনোঃপূত হল না ভূতির। সে ভাবতে বসল আর কোথায় বা রাখা যায়। নাঃ নিরাপদ স্থান বলতে আর কিছুই মনে আসছে না তার।

তবুও নিশ্চিন্ত নয় সে। বেশ মোলায়েম সুরে বললে, তা নয় রাখলি। আমরা তো গাছে সর্বদাই কেউ না কেউ থাকি। আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে চুরি করা খুব সহজ হবে না। কিন্তু টাকাটা নিয়ে কী করবি ঠিক করেছিস?

কিম ভূত এবারেও বিব্রত হল। মৃদু হেসে বললে, এক্ষুণি অত ভেবে লাভ কি? আগে গুপ্তধন নিয়ে আসি তখন ভাবব ওসব কথা।

ভূতি নাছোড়বান্দা। টাকা এসে গেলে তখন আর অত ভাববার সময় থাকবে না। যা কিছু ভাবার আগেই ভেবে ফেলা ভাল।

কিম ভূত মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, তা অবশ্য নেহাৎ মিথ্যে বলিস নি। কীই বা করা যায় তুইই বল না—।

এই চিন্তাটাই হয়ত তার মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছিল। কিম ভূত স্বয়ং তাকে অনুরোধ করতে সে আরও একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। গোল গোল চোখ করে বলল, বলব ব-ল-ছি-স!

হ্যাঁ-হ্যাঁ বল-না—।

ভূতি জিবে ঝোলটানার মত একটা সর সর শব্দ করে বলল, একটা ভালো কোঠা বাড়ী বানাব এই টাকা থেকে। জলে ভিজে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আর গাছে থাকতে ভাল লাগে না। কতকাল আর এরকম কষ্ট করে থাকা যায়।

তবে কোনও পোড়ো বাড়িতে যাব না সেকথা আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।

সে যা ভেবেছিল তা হল না। বিস্মিত হয়ে বললে, সে কি! লক্ষ পুরুষের ভিটে এই নিমগাছ ছেড়ে চলে যাবি!

সে ঘাড় নাড়ল। বাঃ যাবনা-ই বা কেন। কী সুখে আছি আমরা এখানে! সেকেলে ভূতেরা বোকামি করেছে বলে কি আমরাও করব?

আর যেই করুক, আমি অন্তত রাজী নই।

তাছাড়া গাছপালা কেটে মানুষ ঘরবাড়ী তৈরী করতে শুরু করেছে। যে কোনও দিন দেখব আমরাও মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছি। মানুষে আমাদের

মাড়িয়ে যাচ্ছে।

তুই-ই বল না সহ্য করতে পারবি ?

কিম ভূত ঘাড় নাড়লেও, হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

গাছের তলা দিয়ে এক দালাল ভূত যাচ্ছিল।

ভূতির আর তর সইল না। তাকে ডেকে তুলল গাছের ওপর। বললে, একটা পাকা বাড়ী চাই। খোঁজ খবর দিতে পারবি ? নগদ পয়সা দিয়ে কিনব।

দালাল ভূত আমতা আমতা করে বললে, চেষ্টা করতে পারি। এখন আর কেউ পোড়ো বাড়ী ফেলে রাখে না। মানুষের এখন অনেক সাহস বেড়ে গেছে।

এখন মানুষেরই মাথা গোঁজার জায়গার অভাব। তবে খোঁজ রাখতে হবে। সবই এখন ভাগ্যের ব্যাপার। পেলেই তোকে খবর দেব।

দালাল ভূত চলে যেতে ভূতি গালে হাত দিয়ে বসে রইল। আর কীইবা করতে পারে সে।

ভাবতে ভাবতে ক্রমশ ঘেমে ওঠে সে। উঃ কী দারুন সব ফন্দী মাথায় আসছে তার এক এক করে।

কিম ভূতের অবশ্য এসব নিয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল না। থেকে থেকে কেবল শূন্যে হাত পা ছুঁড়ে নিজের শক্তি পরীক্ষা করছিল।

হঠাৎ ভূতি তার পিঠে খিমচি কেটে বললে, হ্যাঁরা বাড়ী তো হবে। তা অত বড় বাড়ী আমার পক্ষে তো দেখাশুনা করা সম্ভব হবে না। দাস-দাসী তো রাখতেই হবে।

তা কজন রাখবি ঠিক করেছিস ?

কিম ভূত হুম্ বলে চুপ করে রইল। সে আবার খিমচি কাটতে, এবার একটু সচকিত হয়ে বললে, তা তুইই বল না—আমি কি আর ও সব বুঝি ছাই।

তা বটে। ভূতি খুশীই হল, সেই বা অত কথা জানবে কি করে।

আবার সে ভাবতে শুরু করল। ভাবতে ভাবতে সে বললে, কম করেও দশটা ভূত আর দশটা পেতনী তো রাখতেই হবে।

তোর আমার কাজ ছাড়াও তো হাজার কাজ আছে।

এবার কিন্তু কিম ভূত আর নীরব রইল না। বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেই বলল, কুড়িজন রাখার কী দরকার। দশজনই যথেষ্ট। পাঁচজন পাঁচজন হলেই চলবে।

ভূতি ঘাড় নাড়ল। না-না তা হয়। নোংরা বাড়ীতে আমি থাকতে পারব না। তার চেয়ে এই নিমগাছ ভাল। আমি গাছেই থাকব।

কিম ভূত বললে, উঁহু তা হয় না। আমি কোঠা বাড়ীতে থাকব আর

তুই গাছে থাকবি তা কি কখনও হয় নাকি? তোকেও এই বাড়ীতে থাকতে হবে!

সে বললে, উঁহু তা কেন। গাছেই থাকব আমরা। দুর্যোগের রাতে বাড়ীতে গিয়ে থাকব।

না-না তা হয় না। গাছ ছেড়ে চলে গেলে গাছ বেদখল হয়ে যাবে তখন আমি গিয়ে হল্লা বাধাতে পারব না।

তাহলে?

তাহলে আর কি দুজনেই বাড়ীতে থাকব।

—নাঃ

—হ্যাঁঃ

—নাঃ

—হ্যাঁঃ

হঠাৎ কিম ভূত গলা টিপে ধরল ভূতির। ভূতিও ছাড়ার পাত্র নয়। সেও গলা টিপে ধরল ভূতের।

কিন্তু তার পরিণাম ভালো হল না।

দুজনেই হুড়মুড়িয়ে গাছ থেকে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

আর কোঠা বাড়ীতে থাকার স্বপ্নও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সেও গলা টিপে ধরল—

খেলা

শ্মশানের গায়ে ভূশুণ্ডির মাঠ।

এই মাঠে সেদিন ওয়ানডে ফুটবল ম্যাচ জমে উঠেছিল। খেলছিল স্থানীয় ছেলেরা। রঙবেরঙের জার্সি আর কালো-সাদা প্যান্ট পরে।

থেকে থেকেই চীৎকার আর চেঁচামেচিতে মুখর হয়ে উঠছিল ক্রীড়াপ্রাঙ্গন। কখনও 'গোল-গোল' কখনও 'মার-মার' শব্দে।

কিম ভূত মগডালে শুয়েছিল। ভূতি বসেছিল পাশে। ওদের দুজনেরই নজর ছিল খেলার দিকে।

ভূতি হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল, দেখত মানুষের কত উৎসাহ। কেমন মিলেমিশে ওরা হৈ-চৈ করছে। তোদের এসব কোনও ব্যাপার নেই।

খালি খাও-দাও শুয়ে থাক আর এর-ওর ঘাড়ে চাপ। ভূত জন্মে আমার ঘেন্না ধরে গেল। কিম ভূত এতই তন্ময় ছিল ভূতির কথা তার কানেই ঢোকেনি। তবে সে যে একটা কিছু বলছে সেটা শুনতে ভুল হয়নি।

ইতিমধ্যে একটা গোল নিয়ে হৈ-চৈ হচ্ছিল মাঠেতে। আন্তর্জাতিক খেলাতেই নাকি এই ধরনের গোল হয়ে থাকে। যে কারণে গোলদাতাকে কাঁধে তুলে সমর্থকেরা নাচতে নাচতে মাঠ প্রদক্ষিণ করছিল।

রেফারির বকাবকিতে সে প্রহসন বন্ধ হয়ে আবার খেলা শুরু হওয়ার মাত্রই কিম ভূত বলল, হ্যাঁ কী যেন বলছিলিস তখন?

এবার ভূতি খুব সংক্ষেপেই বলল তার বক্তব্যটা। দুবার বলার মত মেজাজ ছিল না তার।

কিম ভূত হাত নেড়ে বলল, বলছিস বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষে কি ওই রকমের খেলাধুলো করা সম্ভব?

নাই-ই বা কেন। চারদিক এত মাঠ পড়ে আছে শুধু উৎসাহ চাই। একটু উঠে পড়ে লাগলেই হবে।

বলছিস তাহলে একবার গাবতলায় যাই। মোড়লদের কাছে গিয়ে তোর বক্তব্যটা বলেই দেখি ওরা কি বলে।

গাবতলায় সকাল-বিকাল ভূতের আড্ডা বসে। দুশো থেকে দুহাজার সব বয়সের ভূতই দেখা যায় সেখানে। অবাধ অধিকার।

ভালো মন্দ দুরকম আলোচনাই চলে সেখানে।

ভূতে ভূতে মারামারি বাধলেও যেমন তারা ছাড়িয়ে দেয়, তেমনি আবার

দাঙ্গা বাধিয়েও মজা দেখে। যে কারণে তাদের সুনাম দুর্নাম দুই-ই আছে।

কিম ভূত গিয়ে গুটি গুটি সেখানে হাজির হতেই, ঘেঁটু মুচকি হেসে বললে, অনেকদিন পরে এলি। বল তোর জন্য কী করতে পারি?

সে মাথা নাড়ল। বলল আমার জন্য নয়। সমগ্র ভূত জাতির পক্ষে কল্যাণকর একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। দেখ দিকিনি এটা চালু করা সম্ভব কিনা।

'ভূত জাতি' বলতে রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে গেল সেখানে। যারা এদিক ওদিক মুখ ফিরিয়ে গল্প করছিল, তারাও চোখ ফেরাল সেদিকে।

ঘেঁটু বলল, আমরা ভূতজাতি কোটি কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীতে বসবাস করছি কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোনও খেলাধুলা চালু হলনা। আমরা বাঁচার নামে প্রায় মরেই আছি।

ভূতিই আজ প্রসঙ্গটা তুলল। আর সেই জন্যই এখানে আসা—

প্রসঙ্গটা সকলকেই আকৃষ্ট করল। ডালিম পায়ের ওপর পা তুলে শুয়েছিল। এই প্রস্তাব তার কানে প্রবেশ করা মাত্রই সে লাফিয়ে উঠে বসে বলল, উত্তম প্রস্তাব।

ভূতের মাথা থেকে এ ধরনের চিন্তা বার হওয়া রীতিমত তাজ্জবই বটে। যাহোক বেরিয়েছে যখন, এখুনি এবিষয়ে আমাদের একটা আলোচনায় বসতে হবে। সুবিধা অসুবিধা খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

ঘেঁটু চুপ করেই বসেছিল। ডালিম নীরব হতে সে বললে, খেলা বললেই তো আর খেলা যায় না। খেলাধুলো চর্চা করতে গেলে যে সাজসরঞ্জাম লাগবে সেগুলো আসবে কোত্থেকে শুনি?

ধেনু বললে, ঘেঁটু সাজসরঞ্জাম বলতে কি বোঝাতে চাইছে ঠিক বুঝতে পারছি না।

ঘেঁটু বললে, এই যেমন ব্যাট, বল, জুতো এইসব আর কি।

ধেনু বললে, এখন আমাদের ওসব দরকার কি! আপাতত একটা রবারের বল পেলেই যথেষ্ট।

ঘেঁটু ঘাড় নাড়ল। শুধু বল আনলে কি করে হবে। বলে বাতাস পোরার জন্য পামপু চাই। বল ছিঁড়লে সেলাই কর। বল নরম রাখতে চর্বি মাখাও। ব্লাডার ফুটো হয়ে গেলে ফুটো বোজাও। হাজার ঝামেলা। সেগুলো কিভাবে হবে শুনি?

হুঁকো খুব মন দিয়ে শুনছিল ওদের কথাগুলো। হঠাৎ সে হাত নেড়ে বললে, না-না অত ঝামেলায় কাজ নেই। চামড়ার বদলে আমাদের অন্যকোনও বল চালু করতে হবে।

কী সেটা? আবার প্রশ্ন করল সে।

এই ধর লেবু-টেবু আরকি। এখানে বাতাবি লেবুর গাছের অভাব নেই।

হাত বাড়ালেই তা আমরা পেতে পারি।

বাতাবি লেবুর নাম শুনে সকলের মুখেই হাসির ঝিলিক খেলল। এত সহজে যে এমন একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে কেউই ভাবতে পারেনি।

সকলেই উঠে এল তাদের জায়গা ছেড়ে। তারপর হুঁকোকে কাঁধে নিয়ে দলবেঁধে নাচতে লাগল।

ভূতুড়ে ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি করা হল ভূতিকে। যেহেতু তার মাথা থেকেই চিন্তার উদ্ভব।

ছড়িয়ে পড়ল সে খবর বনাঞ্চলে। গাছে-গাছে স্ফূর্তির জোয়ার খেলল।

দলে দলে ভূতপেত্নীরা এসে ভূতির পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে গেল।

দিনক্ষণ দেখে প্রথম ভূতেদের ফুটবল খেলার দিন স্থির হল।

কাছেই কেওড়া তলার মাঠ। সেই মাঠেই এই খেলা হবে। উদ্বোধন করবে নিম বাগানের প্রবীণতম ভূত লিংকু ফুটুশ।

নির্ধারিত দিনের সত্তর ঘণ্টা আগে থেকে ভূতপেত্নীরা দলবেঁধে যেতে শুরু করেছে সেই দিকে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা সকলেই স্বচক্ষে উপভোগ করতে চায়।

এদিকে চ্যাংড়া ভূতের দল ফুটো হাঁড়ি, ক্যানেস্তারা, ভাঙ্গা বাঁশী ইত্যাদি এখান ওখান থেকে সংগ্রহ করে হাজির হয়েছে সেখানে। যে দলই জিতুক না কেন তাদের সম্বর্ধনা জানাতে হবে তো!

তালতোবড়া উদ্বোধক ফুটুশকে আগেই সেখানে হাজির করা হয়েছে। তাই ভীড় উপচে পড়লেও তেমন কোনও অসুবিধা হল না। মাঠের পশ্চিম প্রান্তে বরাবর যে বটগাছটা ছিল সেই বটগাছের ওপরেই নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হল।

মানুষের অনুকরণেই তারা শ্যাওড়া ফুলের মালা দুলিয়ে দিল ফুটুশের গলায়। তারপর তাকে তার উদ্বোধনী ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধ জানান হল।

ফুটুশ এদিকে খুবই তৎপর। বক্তৃতা কি তাই সে জানে না। তা সত্ত্বেও সে ভালো ভালো কিছু কথা পাশাপাশি সাজিয়ে মোটামুটি একটা ভাষণ খাড়া করে রেখেছিল।

গলায় মালা দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললে, আমার পরম প্রিয় সাথী বৃন্দ, আমরা আর ভূত নই প্রমাণ করার সময় হয়েছে।

মানুষ নিজেদের অক্ষমতাটা আমাদের নামেই ঢাকতে চায়। যে জন্য ভূত অর্থেই তাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে থাকে।

কিন্তু তা আর আমরা কতদিন সহ্য করব। সেই দিন আজ শেষ হতে

চলেছে। আজ মানুষের পরম গৌরব ফুটবল খেলা আমরা খেলব। দেখিয়ে দেব কোন কিছুই আমাদের অসাধ্য নয়।

শুধু তাই নয়, আজ যদি আমরা সফল হই, ভবিষ্যতে মানুষকেও আহ্বান জানাব খেলাতে। বুঝিয়ে দেব আমরা এ-ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি বলেই মানুষের আজ এই আধিপত্য।

কিন্তু সে আধিপত্য মানতে আর আমরা রাজী নই।

ফুটুশ একমিনিট নীরব থেকে হাঁফাতে লাগল। বয়সের ভার বলেও বটে, এত কথা বলা অনভ্যাস বলেও বটে সে দম নিতে লাগল হাঁ করে।

বুকে দম ভরে নিতেই তার মুখে আবার হাসির ঝিলিক খেলল। বললে, হুম, তবে একটা কথা। আমাদের এই খেলা শুরু হবার আগে একথা সকলেরই মনে রাখা দরকার, উচ্ছৃংখল বলে আমাদের বাজারে যে বদনাম আছে, তার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে এখানে।

দেখ যেন খেলাকে কেন্দ্র করে দক্ষযজ্ঞ না বাঁধে। তাহলে আমাদের এই মহৎ প্রচেষ্টার আজ এখানেই সমাধি হইবে।

সেটা নিশ্চয় তোমরা কেউই চাও না।

ফুটুশের কথার মাঝেই 'না—না—না' বলে গুঞ্জন উঠল। এবং ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়তে লাগল দর্শনার্থীদের মধ্যে।

সহস্রকণ্ঠে যখন না—না ধ্বনি সুরের তালে উচ্চারিত হতে লাগল ফুটুশ ভ্যাবাচ্যাকা মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বসে পড়ল তার নির্দিষ্ট আসনে।

জনতা শান্ত হতে বেশ কিছু সময় লাগল।

ইতিমধ্যে দুদল খেলোয়াড়ই নেমে গিয়েছে মাঠেতে। নিমভূত একাদশ বনাম তালভূত একাদশ। খুবই লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করছে তারা শরীরকে সচল করে তোলার জন্য।

কেউ পা ছুঁড়ছে, কেউ হাত ছুঁড়ছে ঘুসি পাকিয়ে, কেউ পা তুলে মাথার ব্রহ্মতালু স্পর্শ করছে। কেউ মাথাটাকে বাঁইবাঁই করে ঘোরাচ্ছে শূন্যে অর্থাৎ সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাইনে যেদিক থেকেই বল আসুক না কেন, যেন দ্রুত-গতিতে হেড দিতে পারে।

কেউ বা ডিগবাজি খাচ্ছে ঘাড় আর কোমরের জোর বাড়ানোর জন্য।

কোন রেফারী নেই। ওই দায়িত্ব নিতে কেউ রাজী হয়নি। যাদের বলা হয়েছিল তারা কাজের ছুতো করে সরে পড়েছে সেখান থেকে।

যে জন্য স্থির হয়েছে রেফারী ছাড়াই এই প্রদর্শনী ম্যাচ খেলা হবে।

বল রাখাই ছিল সেন্টার লাইনের ওপর। সভাপতির নির্দেশ পাওয়া মাত্রই খেলা শুরু হয়ে গেল। নিমভূতের সমর্থকেরা চীৎকার করে উঠল 'বাগাপ' 'বাগাপ' বলে।

ওরা বাগাপ বলতে তালভূতেরা পিছু হটল না। ওরা 'টাগাপ' বলে

দলকে উৎসাহিত করতে শুরু করল।

গোল—গোল—গোল—গোল—গোলের পর গোল ঢুকতে লাগল দুপক্ষের জালেতে। শেষ পর্যন্ত হিসেব রাখাই দায় হয়ে পড়ল।

চুনকুর ছিঁচকে বুদ্ধি খুবই প্রখর। বেগতিক বুঝে সে একটা ইটের টুকরো দিয়ে আঁক কাটতে লাগল পাশেই শ্মশানের পাঁচিলে।

অভূতপূর্ব উদ্দীপনায় থর-থর করতে লাগল রাজ্যের ভূতপেতনীরা।

গোল হল দুশ দশটা। বাতাবি লেবু ফাটল পঁচিশটার মত।

কিন্তু রেফারী না থাকার বিপদ দেখা দিল শেষকালে। খেলা থামানোই দায় হয়ে উঠল। উদ্যোক্তারা প্রাণপণ চীৎকার শুরু করল খেলা শেষ—শেষ বলে। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

একপক্ষ গোল দিলেই অপরপক্ষ মরীয়া হয়ে ওঠে গোল শোধের জন্য। আবার অপর পক্ষ গোল দিলেই এ পক্ষ মরিয়া গোল শোধ দিতে।

ক্রমশ খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমর্থকেরাও জড়িয়ে পড়ল। তারাও চীৎকার করতে লাগল গোল দাও-দাও বলে।

দেখতে দেখতে গোলের সংখ্যা হাজার স্পর্শ করল। তখনও খেলার বিরাম নেই। প্রতি মিনিটে গড়ে দুটো করে গোল হচ্ছে।

এদিকে উত্তেজনায় মেতে থাকলেও খেলোয়াড়দের শারীরিক অবস্থা সঙ্গীন। সকলেই তারা টলছে। ওই কাঠিসার স্বাস্থ্যেতে এত ধকল সইবে কেন।

দেখতে দেখতেই একজন মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু খেলা থামল না, নিমভূতেরা হায়-হায় করে উঠল।

পর মুহূর্তেই বিপক্ষে বিপত্তি। তাদেরও এক খেলোয়াড় ভূপাতিত হল। তারাও হায়-হায় করে উঠল।

এইভাবেই দুপক্ষের খেলোয়াড়েরা একে একে লুটিয়ে পড়তে লাগল মাটিতে। কিন্তু খেলার উত্তেজনা কমল না। গোল-গোল বলে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা সামনে চীৎকার করতে লাগল।

শেষ শক্তি দিয়ে দু'পক্ষ লড়ল। দু'পক্ষের বাইশজন খেলোয়াড়ই পড়ে গিয়ে নিঃসাড় হয়ে গেল। এদিকে লেবুও শেষ।

শেষ মুহূর্তে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় একটা করে লেবু ফেটেছে।

খেলার উত্তেজনা কমতে রীতিমত সময় লাগল। কিন্তু মুস্কিল হল ওই বাইশজন খেলোয়াড়কে নিয়ে। তাদের কারুরই উঠে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। উঠতে গেলেই তারা 'উঃ' 'আ' শব্দ করে পড়ে যাচ্ছিল সেখানে।

ব্যারামটা জানবার জন্য শেষ পর্যন্ত ওদের ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল এক হাকিমের কাছে। সে খেলোয়াড়দের পা নেড়ে চেড়ে বলল, সর্বনাশ হয়েছে।

ওই ভারী লেবু বার বার পা দিয়ে মারার ফলে সকলেরই হাঁটুর খিলেনে

ফাটল ধরেছে। এই ফাটল মেরামত করা খুবই কঠিন। সময় সাপেক্ষও বটে। এখুনি এ ফাটল জুড়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সে কথা শুনে ওই বাইশজন খেলোয়াড়ই হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করে কেঁদে উঠল।

সখ করে ফুটবল খেলার এই অশুভ পরিণামের কথা কেউই আগে ভাবতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গেই ফুটুশ ঘোষণা করে দিল ভূতেদের ফুটবল খেলা চির-কালের জন্য নিষিদ্ধ হইল।

স্বভাব

কিম ভূত ছেলেবেলায় খুব ডানপিটে ছিল শুনে তো ভূতি হেসেই খুন। খিঁক খিঁক করে হাসতে হাসতে তার এমন অবস্থা হল, শব্দটা কুস্বরে পরিণত হয়ে গঁ-গঁ-গঁ শব্দ হতে লাগল।

এত হাসির কিইবা কারণ থাকতে পারে কিম ভূতের মাথায় এল না। ছেলেবেলায় কে-না ডানপিটে থাকে, এমন কি মানুষও!

মানুষের বেলায় যদি তা দোষ না হয় ভূতের বেলায় বা তা হবে কেন।

তাছাড়া এ তো কাল্পনিক ব্যাপার নয়, চোদ্দ আনাই সত্যি। যে জন্য সে মনে মনে বেশ খানিকটা চটে গেল।

ভূতির কান টেনে বসিয়ে দিয়ে বললে, তোর কি মাথার ইস্ক্রুপগুলো ঢিলে হয়ে গিয়েছে। বলি হচ্ছেটা কি!

কিম ভূতকে সে হাড়ে হাড়েই চেনে। আছে আছে বেশ আছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুরছে মজা করছে মস্তানি করছে কিন্তু মাথা গরম হলে আর রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে বসবে নিমতলায়। ভাঙচুর তো করবেই, দু চারটে অঙ্গহানিও করে ছাড়বে।

ভূতি চট্ করে গলার স্বর দুপর্দা নামিয়ে এনে বললে. অত মাথা গরম করছিস কেন? একটু মসকরা করছিলাম আর কি।

তুই যে ছেলেবেলায় দুরন্ত ছিলিস এ খবর পাড়ার সকলেই জানে। যারা স্বচক্ষে দেখেনি তারা গজুভূতের মুখ থেকে অন্তত শুনেছে।

তার মুখ থেকে এই কথা শোনা মাত্রই কিম ভূতের মেজাজ জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। তার কাঁধে হাত রেখে বলল, সবই জানি। দেখছিলাম ভয় পেয়ে তুই কি করিস!

তার কথা শুনে ভূতি একটু বিব্রতই হল। কিম ভূত যে তাকে এমন একটা কথার প্যাঁচ মারবে, সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

দুজনেই নীরব। কে যে জিতল ঠিক বোঝা গেল না। তবে কিম ভূত নিশ্চিত ছিল, যে ভূতি শক্তি বা কথা কোনটাতেই তার সঙ্গে পেরে উঠবে না।

হঠাৎ ভূতি আবার সরব হল। মুচকি হেসে বললে, তুই যে ছেলেবেলায় খুবই দুরন্ত ছিলিস বলে গর্ব করিস, এমন কি ঘটেছিল যে দুরন্তপনা ছেড়ে একেবারে মাটির ভূত হয়ে গিয়েছিস। কেউ কি তোকে কোনওরকম তুকতাক করেছিলো নাকিরে?

কোনওরকম ইতস্ততঃ না করেই সে বললে, সে এক ইতিহাস। যদি শুনতে চাস তো বলি।

ঃ হ্যাঁ-- হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তোর কীর্তি আমি শুনব না এ কখনও হয়।

গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে এতক্ষণ বসেছিল কিম ভূত। ভূতি গল্প শোনার আগ্রহ দেখাতে সে মগডালে উঠতে উঠতে বললে, ওপরে চ। মগডালে না গুছিয়ে বসলে ঠিকমত গল্প জমে না।

ভূতি তাকে অনুসরণ করল।

প্রায় আরাম কেদারার মতই মোটা গাছের ডালটায় হেলান দিয়ে বসে কিম ভূত বলল, তখন আমার বয়স কতই বা হবে হাজার দুয়েকের মত। সবে পশুপক্ষীর ঘাড় মটকে খেতে শিখেছি।

একমুহূর্ত স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। অন্য ভূতপেতনিরা যখন ঠাকুমা দিদুমার কোলে চড়ে মানুষের দুরন্তপনার গল্প শোনে, আমি তখন গাছে—গাছে পা দিয়ে ভর দুপুর বেলায় সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাজির হতাম। আর ঘুরে ঘুরে জাহাজ দেখতাম।

দেশবিদেশের নোঙর করা ঢাউস ঢাউস জাহাজগুলো দেখে ভাবতাম, যারা এইসব জাহাজ চালায় তারা কী দারুণ সুখী। খাও দাও আর জাহাজ চড়ে চড়ে দেশবিদেশ ঘোরো। বাড়তি কোনও কাজকম্ম করতেই হয় না উপরন্তু বেড়ানোর আনন্দ।

ইস্ আমার কপালে যদি এরকম একটা সুযোগ ঘটত, সারা পৃথিবীটা বিনি পয়সায় বেড়িয়ে নিতাম। শুধু তাই নয়, সারা পৃথিবীতে আমাদের স্বজাতি যারা রয়েছে তাদের সঙ্গেও আলাপ করে আসতাম।

বিদেশী স্বজাতিরা আমাদের গৌরব তো বটে।

এত কথা রোজই ভাবি বটে কিন্তু সুযোগ তেমন ঘটছিল না। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনতে হচ্ছিল।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশে মেঘলা মেঘলা ভাব। মেঘের আড়াল থেকে সূর্যদেব মাঝে মাঝে উঁকি মারছে বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মেঘে ঢাকা পড়ছে।

গঙ্গার ধারে ঝাঁকড়ালো একটা অশ্বত্থ গাছের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবছিলাম এখনি যদি বৃষ্টি নামে কোথায় আশ্রয় নেব। যতদূর দৃষ্টি যায় পোড়ো ঘর বাড়ীর তো নামগন্ধ নেই।

একমাত্র সারবদ্ধ জাহাজগুলোই মুখের সামনে ভাসছে। সবচেয়ে কাছে যেটা তার গায়ে লেখা 'হ—নু—লু—লু'।

জাহাজটা ছাড়বে ছাড়বে করছে। তার চিমনি দিয়ে ভক্ ভক্ করে কালো ধোঁয়া বের হতে শুরু করেছে। বয়ায় বাঁধা শিকল অবশ্য তখনও

আলগা করেনি।

জাহাজের ক্যাপ্টেন নাবিকদের মাঝে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি যেন একটা বোঝাবার চেষ্টা করছে।

মনে হল এই সুবর্ণ সুযোগ। মালবাহী জাহাজ। ফিরে যাচ্ছে খালি অবস্থায়। এরমধ্যে ঢুকে পড়লে কেমন হয়। বিনি পয়সায় তো দেশবিদেশ বেড়ানো যাবে।

জাহাজের গায়ে একটা নৌকা বাঁধা ছিল। তার ছাউনির মাথায় পা রেখে একেবারেই হাজির হলাম জাহাজের সিঁড়িতে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অনেকেরই মুখ মনে পড়তে লাগল। একান্ত আপন জন ছাড়াও আমার প্রিয় কোলাব্যাঙটার জন্যে ভাবনায় পড়লাম। আমি ছাড়া সে কারুর হাতেই পোকা খেতে চায় না।

হঠাৎ মনে হল ধ্যুৎ, অত ভাবলে যাওয়াই হয় না। জয়মা কালী বলেই ডেকের দিকে পা বাড়ালাম।

প্রথমেই বাধা। ডেকের মুখেই এক লগবগে সিং সাহেব জাহাজে প্রবেশের অনুমতি পত্র পরীক্ষা করছিল। তাকে টপকে যাওয়াই বিপদ। চোখ দুটো তার ছুরি গুলির মতই ঘুরছিল চারপাশে।

কি করি। একটা খালি কাঠের পিপে নিয়ে একজন ঢুকছিল ডেকে। ফুড়ুক করে ঢুকে পড়লাম তার ভেতরে।

সাহেব পিপেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করল, ইস্‌কা ভিতর কেয়া হ্যায়?

সে জবাব দিল, কুছ নেহি। বিলকুল খালি।

সাহেবের বিশ্বাস হল না। আঙুল দিয়ে দুবার টোকা মারল পিপের গায়। উঁ—হু ঝুটা বাত! বোলো কেয়া হ্যায়?

সে আবার বলল, কুছ নেহি।

সাহেব রেগে গেল। কুছ নেহিতো এইসা ঢপ্‌ ঢপ্‌ শব্দ হোতা হ্যায় কাহে।

ভেতরে বসে আমি সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার তো তখন ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা। এখন সে কি উত্তর দেয়। খুলে দেখালেই তো গিয়েছি।

সে বাঁচিয়ে দিল। বলল, স্যার ধান গাছকা তক্তামে তৈয়ার হুয়া হ্যায়। উসি লিয়ে এইসা শব্দ।

ধান গাছকা তক্তা? সাহেবের দুচোখ বিস্ফোরিত হলেও, ক্রমশ তা স্বাভাবিক হয়ে এল এবং তাকে ছেড়ে দিল।

ডেকের ওপরে পিপের মধ্যে থেকে তাকাচ্ছি এদিক ওদিক। যাত্রীরা একে একে তাদের কেবিনে ঢুকে যাচ্ছে।

হঠাৎ দেখি সেই লগবগে সিং সাহেবটা পুঁই ই—ই পুঁই করে মুখে শিস্‌
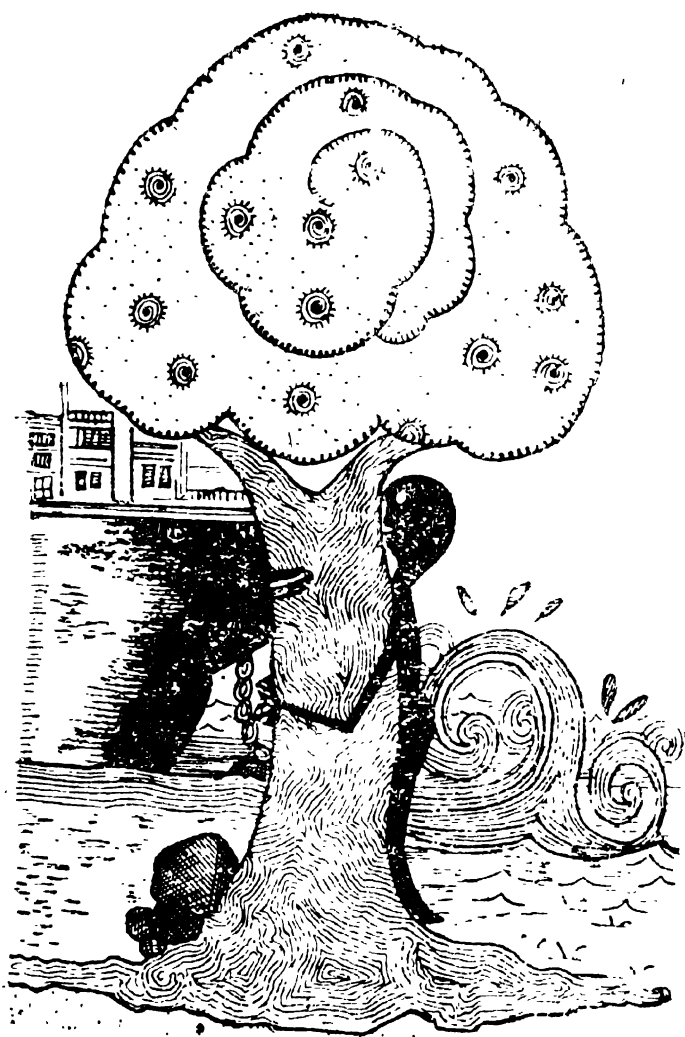
জাহাজটা ছাড়বে ছাড়বে করছে।

দিতে দিতে এই পিপের দিকেই এগিয়ে আসছে।

সাহেবকে দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।

পিপের মধ্যে বসে বসেই দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপিনি শুরু হয়ে গেল।

সাহেবের চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই। আর কোন শাস্তি না হলেও একশ ঘা শঙ্কর মাছের চাবুক তো পিছনে পড়বেই। অতএব পিপে থেকে পালাতেই হবে যে ভাবে হোক।

পিপের উল্টোদিকেই একটি কেবিন। কেবিনের দরজা খোলা। ভিজে ফুটবলের মাঠে সর্‌রা খাওয়ার মতোই চলে গেলাম পিপের মধ্যে থেকে কেবিনের মধ্যে।

সাহেব মচ্‌ মচ্‌ করে চলে গেল, দাঁড়াল না।

কেবিনের ভেতরের টেবিলের ওপরে থরে থরে খাবার সাজানো।

একটা বড় রেকাবিতে আস্ত দুটো সিদ্ধ মুরগী রয়েছে। পাশে একগ্লাস কমলালেবুর লালচে রস।

দুটো নেংটি ইঁদুর ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়েনি সেদিন। খিদেতে তাই পেট চোঁ-চোঁ করছিল।

সিদ্ধ মুরগী খাওয়ার সখ অনেক দিনের। এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়ার নয়।

দুটো মুরগী যেন দুই টিপ নস্যি। শুধু গপ্‌ গপ্‌ করে দুবার শব্দ হল মাত্র।

কমলার রসটায় চুমুক দিতেই সারা দেহের ক্লান্তি মুহূর্তের মধ্যে মুছে গেল।

আরামে ভাসতে ভাসতে তাকালাম কেবিনের জানলা দিয়ে। জল জল জল শুধু জল!

ইতিমধ্যে জাহাজ গঙ্গা ছেড়ে সাগরে পড়েছে। জানলা দিয়ে সাগরের ফুর ফুরে হাওয়া এসে লাগছে গায়।

মাছ ধরা নৌকা দু-চারটে যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, প্রায় কাগজের নৌকার মতোই নাচছিল সাগরের জলে।

আমি যখন অবাক হয়ে ওই দিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ 'দুম' করে একটা লাথি মারার শব্দ হল দরজায়।

সাথে সাথেই উঠে দাঁড়ালাম। আরেঃ এ যে সেই লগবগে সিং সাহেবের হেঁড়ে গলা!

ওর সেই লোমশ হাত দুখানা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। ওই হাতের একটা রদ্দা আমার ঘাড়ে পড়লে আর দেখতে হবে না। এই লিকলিকে

ঘাড় গুঁড়িয়ে পাউডার হয়ে যাবে।

আবার না খুললেও বিপদ। সাহেব তো দরজা ভেঙ্গে ঢুকবেই।

খিল খুলে দিলাম। সাথে সাথেই লুকিয়ে পড়লাম আলমারীটার পিছনে।

সাহেব ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে চারদিকে কটকট করে তাকাতে লাগল।

ঘরটা এতক্ষণ বন্ধ ছিল আবার হঠাৎ খুলে গেল কেন ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে একবার মুখ বাড়াল। তারপর তার প্রকাণ্ড টাকটায় হাত বুলাতে বুলোতে বিছানায় এসে বসল।

আমার অবস্থা তখন আরও কাহিল। আলমারীর পিছনে ফড়িং-এর মত বড় বড় মশা। আমাকে কামড়ে রক্তের আস্বাদ না পেয়ে, রেগে মেগে আরও জোর-জোর হুল ফোটাতে লাগল।

মুখ টিপে বসে আছি। একটা শব্দ হওয়া মানেই সাহেবের হাতে ধরা দেওয়া। একবার সাহেবের চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই।

মনে মনে হুল ফোটানো গুনছি। ডবল সেঞ্চুরী ছুঁই-ছুঁই হঠাৎ সাহেব আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। পকেট থেকে চাবিটা বার করে, আলমারী খুলে কিছু একটা বার করতে এল।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়।

সাহেব এতকাছে এসে দাঁড়ালে আমার গায়ের গন্ধ পাবেই। আর ভূতের গায়ের গন্ধ বলে কথা, সেই গন্ধের রেশ ধরে যদি এগিয়ে আসে তাহলেই তো অঘটন।

এখনই বাঁচার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

আলমারীর পিছনে বসে, তলা দিয়ে হাতদুটো বাড়িয়ে দিলাম। সাহেব এসে দাঁড়াতেই, ওর পা দুটো ধরে মারলাম সজোরে একটান।

ব্যস্ সাহেব কুপোকাৎ।

আমি জানলা দিয়ে মারলাম লাফ। পড়লাম সাগরের জলে।

মশার হুলের খোঁচায় তখন সারা দেহটাই হু—হু করে জ্বলছিল। জলে পড়া মাত্রই সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

এদিকে সাহেব ভূপাতিত হলেও তার বিস্ময় বাড়ল বই কমল না। সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে এসে জানলার রড ধরে দাঁড়াল।

আমি নিজেকে বিপদমুক্ত করার জন্য তখন জোর সাঁতার কাটতে শুরু করেছি।

সাহেব জানলায় দাঁড়িয়ে বিড়—বিড় করে যেন কিসব বকতে শুরু করল। তারপর হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়েই আমার উদ্দেশে জানলা দিয়ে অবিরাম ঘুঁষি ছুঁড়তে লাগল।

ভাবখানা এমন যেন আমি তার একহাতের মধ্যে রয়েছি।

ভেসে চলেছি তো চলেইছি। ডাঙ্গা আর চোখে পড়ে না।

জাহাজ দু'একটা চোখে পড়ছে বটে কিন্তু সবই আমার নাগালের বাইরে।

এদিকে সাঁতার কেটে কেটে হাত-পা টাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনই উপায় নেই।

খিক্ করে এক ঝলক হেসে সে বললে, এইভাবেই প্রায় একশ বছর কেটে গেল। এই জলে থাকার সময় একটা হাঙ্গর পুষেছিলাম। ওর পিঠে চড়েই আমার অর্ধেক সময় কেটে যেত।

একদিন হাঙ্গরটার পিঠের ওপর শুয়ে সাগরের জলে ভেসে আছি, হঠাৎ একটা মাছ ধরা ছিপ নৌকা চোখে পড়ল। নৌকাটা আমার দিকেই এগিয়ে আসছিল।

নৌকাটাকে নাগালের মধ্যে পেতেই, আমি উঠে পড়লাম। উঠেই দেখি চালক বিদেশী হলেও স্বজাতি। ওরা একটা নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মাঝপথে নৌকা ডুবে যায়। এবং সবাই মারা যায়।

সে নৌকাটার মায়া কাটাতে পারেনি। ভূত হয়ে ওটা নিয়েই ও সাগরে সাগরে ঘুরে বেড়ায়।

আমার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেল। ও অনর্গল বলে যেতে লাগল মনুষ্য জনমে ওর দেশের কথা, বাড়ীর কথা, মা-বাবার কথা। আমি নীরবে শুধু ঘাড় নাড়তে লাগলাম।

ওকে এখন আমায় খুশী রাখতেই হবে। নচেৎ এখুনি নামিয়ে দেবে নৌকা থেকে। আবার জলে পড়তে হবে।

অনেক ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত ফিরে এলাম এখানে। অনেক দিন ছিলাম না। সেকি আদর আমার।

তবে সকলে একই কথা বলতে লাগল, কি ছিলিস আর কি হয়ে গিয়েছিস। এখন যে তোর মুখ থেকে রা সরে না রে—

ভূত এক মুহূর্ত থামল।

ভূতি এতক্ষণ হাঁ করে কিম ভূতের কথা শুনছিল। বললে, তা তুইতো নদীর দেশের ভূত। জলে পড়ে তোর স্বভাব এত পরিবর্তন হল কেন?

কিম ভূত একটা ঢোক গিলে বলল, সাগরে ওই বন্ধুর মুখ থেকে শুনে-ছিলাম ওই সাগরের নাম ছিল প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরের জল যার পেটে পড়ে, সেও নাকি ওই সাগরের মতোই শান্ত হয়ে যায়।

আর আমিও তাই—

বলবি তো! ভূতি—হিঁ—হিঁ—হিঁ করে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগল।

চুল

আকাশ জুড়ে পূর্ণিমার চাঁদ। আলোর খই ফুটছে সারা বনভূমি জুড়ে।

সেদিন আর খাবার পাট নেই। ব্রহ্মদৈত্যির জন্মদিন উপলক্ষ্যে নেমন্তন্ন ছিল। সেখান থেকে খেয়ে দেয়ে এসে কিম ভূত আর ভূতি গাছের ডাল ধরে মনের আনন্দে দোল খাচ্ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ দোল খাওয়ার পর ভূতি হঠাৎ দোল খাওয়া বন্ধ করে বললে, আর পাচ্ছি নে। গা ঢিস্-ঢিস্ করছে। যা খাইয়েছে ব্রহ্মদা। এখন একটু শুতে পারলে হয়।

কিম ভূত দোল খাওয়া থামাল না। দুলতে দুলতেই বলল, খেয়েদেয়ে দোল খাওয়া ভালোরে। তাড়াতাড়ি সব হজম হয়ে যায়।

এইত আমার একটু একটু ক্ষিদে পেতে শুরু করেছে।

কিম ভূতের কথা শুনে ভূতি দোলাটা আবার দুলিয়ে দিয়ে হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ করে হাসতে লাগল।

দুজনেই যখন খুশীতে বিভোর, গেরুয়া বসনধারী এক সাধু, কাঁধে একটা পুঁটলি নিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাচ্ছিল সেখান দিয়ে।

ভূতিরই প্রথম চোখে পড়ল। ভূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, আহা সাধুটার পায়ে নিশ্চয় বাত আছে। কত কষ্ট করেই না পথ হাঁটছে।

তার ওপর ওই ভারী বোঝা কাঁধে বওয়া কি সোজা কথা।

কিম ভূত আড়চোখে সাধুকে দেখে নিয়ে বললে, সবই ভাগ্যরে। দেখ সাধু হয়েও বেচারির শান্তি নেই।

ভূতি বললে, আমরা তো ওকে কিছুটা শান্তি দিতে পারি।

কিম ভূত বললে, যেমন ?

—এই ধর ওর পুঁটলিটা আমরাই যদি কিছুটা বয়ে দি।

—কি করে ?

—কেন, ওর কাঁধ থেকে আমরা পুঁটলি তুলে নিয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে চলব। ও যেখানে থামবে সেখানে পুঁটলিটা নামিয়ে দেব।

—বাঃ ভালো বুদ্ধি খাটিয়েছিসতো। আমার কোনও আপত্তি নেই। বলিস তো আমিই যাব।

হ্যাঁ, তাই যা। আমি ততক্ষণে একটু গড়িয়ে নিই।

কাঁধের পুঁটলিটা হঠাৎ হালকা মনে হতে সাধু মনে মনে খুশীই হল। গায়ের চাদরের খুঁট দিয়ে সে কপালের ঘাম মুছল।

পরমুহূর্তেই কাঁধের ওপর চোখ পড়তে সে রীতিমত অবাক হল।

পুঁটলিটা তার কাঁধের ওপর থাকলেও চার আঙ্গুলের মতো ব্যবধান রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই চলছে।

সাধু সবিস্ময়ে কবার চোখ পিট্ পিট্ করল। তবে এটা যে কোনও অশরীরীর কাজ সেটা বুঝতে তার বাকি রইল না।

কোনওরকম হৈ-চৈ না করে সে নীরবেই পথ চলতে লাগল।

বিনা কষ্টেই সে পেঁাছে গেল তার গন্তব্যস্থলে। তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলল না। মুখ তুলে বলল, তুমি যেই হও বাছা আজ আমার যে উপকার করলে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কিন্তু আমি ঋণীও থাকতে চাই না।

আমার যেমন উপকার করলে আমিও তেমনি তোমার একটা উপকার করতে চাই। আমার কাছে একশিশি অলৌকিক কেশ তেল আছে।

এই তেলের একটিই গুণ। অঙ্গের যেখানে এ তেল লাগানো যাবে সেইখানেই কালো ঘন চুল গজাবে।

এই কেশ তেলটা আমি তোমাকে উপহার দিচ্ছি। আমার পুঁটলি থেকে তুলে নাও।

সাধুর কথা সবই কিমভূতের কানে আসছিল। সে যে এরকম একটা জিনিস উপহার দিতে পারে সে ভাবতেই পারেনি।

পুঁটলির ফাঁক দিয়ে শিশির মাথাটা দেখা যাচ্ছিল কিম ভূত আর দেরী না করে শিশিটা টেনে নিল পুঁটলি থেকে।

সাধু তাকে না দেখতে পেলেও, তেলের শিশিটা পুঁটলি থেকে উবে যেতে খুশীই হল।

কিম ভূত আর একমুহূর্ত দেরী করল না। শিশিটা বগলদাবা করে সোজা দৌড়ল নিম গাছের দিকে।

ভূতি তখনও ঝিমুচ্ছে।

সে গিয়ে তার পিঠে একটা চিমটি কাটল। ভূতি লাফিয়ে উঠে বসতে, সে বলল, একটা দারুণ জিনিস এনেছি। শুনলে তুই খুশীতে অজ্ঞান হয়ে যাবি।

ভূতি ঘুমে ভেজা চোখ দুটো গোল গোল করে বললে, শুনি কি? কিম ভূত বলল, কি আবার কেশ তেল।

কেশ তেল? সে হেসে লুটোপুটি খেতে শুরু করল গাছের ওপর।

তার হাসির কারণ কিমভূত ধরতে পারল না। ফ্যাল-ফ্যাল করে তার মুখের দিকে পাঁচমিনিট তাকিয়ে থেকে বেশ বিরক্তি ভরেই বললে, কিরে হাসছিস যে বড়। এত হাসির খোরাক পেলি কোত্থেকে?

ভূতি সেই তেলের শিশিটা দেখিয়ে আবার হাসতে শুরু করল !

কিন্তু ভূত একটু বিরক্তই হল। মাথায় দুটো গাট্টা মারার জন্য তার হাত শুড় শুড় করতে লাগল।

কিন্তু ভূতের চোখে আগুনের ঝিলিক দিতেই, ভূতির মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। ইনিয়ে বিনিয়ে বললে, কেশ তেল আনলি। মাখবি কোথায়, দেহে তো একগাছাও চুল নেই।

শুনে সে ভ্রূ কুঁচকাল। কি বললি ?

সে ওই একই কথার পুনরাবৃত্তি করল।

কিন্তু ভূত বললে, ধ্যুৎ, এ তেল সে তেল নয়। এ সম্পূর্ণ আলাদা—

যেমন ? ভূতি সকৌতূহলে উঠে বসল।

—সাধুর পুঁটলি বওয়ারই পুরস্কার এটা।

সাধু যাবার সময়ে বলে গিয়েছে এই তেল দেহের যেখানে লাগাবে সেখানেই চুল গজাবে।

'সত্যি' বলে এমন লাফিয়ে উঠল, আর একটু হলেই প্রায় ভূপাতিত হচ্ছিল ভূতি। নেহাৎ খপ্ করে গাছের ডালটা ধরে ফেলেছিল বলে তাই সে যাত্রা কোনও ক্রমে রক্ষা পেয়ে গেল।

এবার সে হাত বাড়াল সেটা হাতের মুঠোয় পাবার জন্য।

কিন্তু ভূত দেখল কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে পড়ে গেলেই সব আশা শেষ। তার চেয়ে ভূতির কাছেই রাখা যাক। তারপর ভেবে দেখব কিভাবে তেলটা কাজে লাগাব।

ভূতি শিশিটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। মুখে তার একগাল হাসি।

সেই খুশীরচ্ছটা বেশীক্ষণ রইল না। হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে বললে, হ্যাঁরা সাধুতো গুল মারতেও পারে।

এই তেল থেকে যে চুল গজাবেই তার কি প্রমাণ আছে। নাওতো গজাতে পারে।

কিন্তু ভূত আমতা আমতা করে বললে, আশ্চর্য কি ? সাধু তো আর দেবদূত নয়। রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। না ঠকানোই আশ্চর্য !

তবে পরীক্ষা করে দেখতে আপত্তি কি ?

ভূতির মুখে আবার খুশীর ঝিলিক খেলল। বললে, পরীক্ষাটা আমিই করি বেশ। সে সেই শিশির ছিপিটা খুলে ফেলল।

শিশি কাৎ করে একফোঁটা তেল সে ফেলল পায়ের চেটোর তলায়। ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের তলা ভর্তি হয়ে গেল নরম তুল-তুলে লালচে চুলে।

দেখেতো ভূত ও ভূতি দুজনেই খুশী। ভূতি ইচ্ছে করে অপর পায়ের তলায়ও একফোঁটা তেল লাগাল।

ভূতি হাসল। দুই পায়ের তলায় চুল। এখন হাঁটলে খুবই আরাম হবে।

কিম ভূত বললে. তাহলে আমার পায়ের তলায়ও দুইফোঁটা দিয়ে দে। জুতো পরার সাধ মিটবে।

দিতে গিয়েই হল বিপত্তি। শিশিটা ভূতের হাতের ধাক্কায় কাৎ হয়ে পড়ার সাথে সাথে প্রায় সব তেল পড়ে গেল কাদায়।

হায়—হায় করে উঠল কিম ভূত। কাদায় আছে জল। জলে তেলে মিশে গেলে তাতে আর লাভ নেই।

ভূতি কাঁদো কাঁদো। কতদিনের সখ মানুষের মতো মাথায় ঘন চুল হবে। যাওবা সুযোগ এল তাও ভেস্তে গেল।

কিম ভূত তাকে ভরসা দিল। বললে, আমার চুল দরকার নেই। এই নেড়া মাথাই আমার ভালো। জীবজন্তু ধরে আমাকে খেতে হয়। মাথা ভর্তি চুল নিয়ে কি করব।

তারচেয়ে শিশিতে তলানি যে তেলটুকু পড়ে রয়েছে তুইই মাথায় মাখ। তোর তো অনেকদিনের সখ খোঁপা বাঁধার।

কথাটা মিথ্যে নয়। মানুষ হবার সখ ভূতিরই বেশী। তাই মানুষের অনুকরণেই সব কিছু সে করতে চায়।

ভূতি গররাজি নয়। মুচকি হেসে বললে, সাতজন্মের ধুলো মাথায় জমে বসেছে। চুল গজাবে কোথা দিয়ে। মাথার চাঁদিটা ঝামা দিয়ে ঘসে আসি আগে দাঁড়া। তারপরে তেল মাখব।

ছুটল সে মাথা ঘষতে। নদীর ঘাটে গিয়ে একটা ঝামা যোগাড় করল। সেই ঝামা ঘষতে লাগল মাথায়।

ঝামা ঘষে ঘষে মাথা তেমন পরিষ্কার না হলেও ঝামাটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এতোই পাতলা হয়ে গেল তাকে আর ঝামা বলে চেনার কোনও উপায় রইল না।

এদিকে নতুন ঝামাও আর তার চোখে পড়ছে না।

ভূতি অগত্যা নদীর ঘাটেই মাথা ঘষে। পাথরের মতোই জমে শক্ত হয়ে গিয়েছে ধুলোগুলো। সে কি অত সহজে উঠতে চায়!

এদিকে কিম ভূত ভেবে ভেবে অস্থির। মাথা পরিষ্কার করতে কোথায় গেল ভূতি? কেউ ধরে নিয়ে গেল নাতো?

ইতিমধ্যেই ভূতি এসে হাজির। মাথার চাঁদিটা তার বেলের মতোই চকচক করছে। বেশ খুশী খুশী ভাব।

কিম ভূতের গায়ে একটা আঙ্গুলের খোঁচা দিয়ে বললে, দেখত হয়েছে? এইবার তাহলে তেল মাখি?

সে কোনও সাড়া দিল না। নীরবে ঘাড় নাড়ল।

সন্ধ্যাবেলায় যখন ভূতির ঘুম ভাঙ্গল হৈ-হৈ পড়ে গেল ভূতের রাজ্যে।

কিম ভূত দেখল গাছের তলায় ভীড়ে ভীড়। অসংখ্য ভূতপেত্নি ঘাড় উঁচু করে কি দেখছে।

প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে কিম ভূতের একটু সময় লাগল। তাড়াতাড়ি ভূতিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলল, দেখ কি কাণ্ড!

ভূতির তো চক্ষু ছানাবড়া। একরাশ লালচে চুলে তার মাথা ঢেকে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই চুল বেড়ে কাঁধ স্পর্শ করেছে।

সে মনের আনন্দে মাথা ঝাঁকায় মানুষের মতো। চুলগুলো বাতাসে ওড়ে পত-পত করে।

সে যতোই ওসব করে গাছের তলায় ততোই হৈ-হল্লা বাড়ে। কচি কচি ভূতপেত্নির দল চুল দেখে তো আহ্লাদে আটখানা।

তাদের খুব ইচ্ছে হাত দিয়ে ওই চুল স্পর্শ করার। অনেকে গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল চুল ছোঁওয়ার জন্য।

চুল আগলাতে আগলাতে ভূতির তো প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়।

এদিকে চুল বাড়ছেও দ্রুত গতিতে। প্রতিদিন এক ইঞ্চি। বারো দিনে বারো ইঞ্চি। মাসে আড়াই ফুট!

ভূতি বলল, চুল তো গজাল। যে ভাবে বাড়ছে এখন সামলাই কি করে।

কিম ভূত বলল কেন, ববছাঁট দে—

—বব ছাঁটব। ভালো কথাই বলেছিস। কাঁচি পাই কোত্থেকে।

কাঁচি—কাঁচি—কাঁচি! কিম ভূত বেরিয়ে পড়ল কাঁচির সন্ধানে। এ বাড়ী সে বাড়ী, এ দোকান সে দোকান উঁকি মারল। কোথায় কাঁচি?

এক মালি বাগানে ঘাস কাটছিল। কিম ভূত তাক্ বুঝে তার ঘাস ছাঁটা কাঁচিটা নিয়েই পালিয়ে এল। কাঁচি দেখে ভূতি হেসে অস্থির।

ঘাস-ছাঁটা কাঁচি দিয়ে কখনও চুল ছাঁটা যায়।

তাহলে কি হবে? কিম ভূত ভেবে অস্থির।

ভূতি বললে, কি আর হবে। দু চারদিন চুল খুলেই শুই তারপর যাহোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

সেদিন মেঘলা ছিল। চাঁদ পুরোই ঢাকা পড়ে গেছিল মেঘেতে।

একপাল গোদা হনুমান যাচ্ছিল সেই নিমগাছের তলা দিয়ে। যেতে যেতে হঠাৎ মোটাসোটা গোলগাল হনুমানটা বললে, আয় কিছুক্ষণ এই নিমগাছের তলায় বিশ্রাম করা যাক। একটানা আর অত হাঁটতে পারি নে।

সকলেই অল্পবিস্তর ক্লান্ত ছিল। মোটার প্রস্তাব শুনে কেউই আপত্তি করল না। সকলেই গোল হয়ে সেখানে বিশ্রাম করতে বসল।

হঠাৎ শুঁটকো হনুমানটা বললে, দেখ নিমগাছের কেমন ঝুরি নেমেছে।

ঝুরিতো এতদিন বটগাছে বেরোয় বলেই জানতাম। কালে কালে কি হল রে!

শুঁটকোর কথা শুনে সকলেই তাকালো ওপর দিকে। সত্যিই তো, সে ঠিকই বলেছে। তাজ্জব ব্যাপারই বটে।

পালের গোদা অর্থাৎ লেজ ছাটা হনুমানটা পিট-পিট করে ওপরে তাকিয়ে, মুচকি হেসে বলল, তাহলে নিমের ঝুরি ধরে একটু দোল খেয়ে নেওয়া যাক কি বলিস?

দোল খাবার চিন্তাটা এতক্ষণ কারুরই মাথায় আসেনি। গোদা বলামাত্রই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল তাদের মধ্যে দোল খাওয়ার জন্য।

কেউই এই সুযোগ ছাড়তে চায় না। লাফিয়ে লাফিয়ে সকলেই সেই চুলের ডগা ধরল। তার দিকে তাকিয়ে বললে, জোরসে একবার দুলিয়ে দে তো—।

সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করল। পরম খুশীতে দুলতে লাগল হনুমানের দল।

ভূতি বেশ নাকডাকিয়েই ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ নীচে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ শুনে কিম ভূতকে ধাক্কা মারতে লাগল।

কিম ভূতের চোখদুটো ঘুমে প্রায় আঠার মতোই জুড়েছিল। ভূতির ধাক্কা খেয়ে, দু আঙ্গুল দিয়ে একরকম জোর করেই তার চোখের পাতা দুটো ফাঁক করল।

সে কাঁচুমাচু মুখ করে বললে, আমার চুলের গোড়ায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে কি ব্যাপার বলত?

কিম ভূত দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে, কি পাগলের মতো বকছিস। শুধু শুধু শব্দ হবে কেন?

—তাতো জানিনা। ঘুম ভেঙ্গে গেল তো এই শব্দ শুনে।

আকাশের দিকে চেয়ে কিম ভূত একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল, তেলাভাব। চুলের গোড়ায় এখুনি আবার তেল দেওয়া দরকার। নির্ঘাত মরচে ধরে গিয়েছে।

ভূতি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। সে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কিম ভূত বলল, কিছুক্ষণ পরে ও আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়।

ওদিকে হনুমানের দল দুলে দুলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং কয়েকমুহূর্ত বিশ্রাম নিচ্ছিল। ভূতির ঘুমেতে তাই আর কোনও ব্যাঘাত হল না।

গোদা হনুমান এবারে ওদের নামিয়ে নিজেই সেই চুল ধরে ঝুলে পড়ল এবং হুস্-হুস্ করে দোল খেতে লাগল।

চুলগুলোর গোড়া ইতিমধ্যেই কিছুটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। সে ধরতেই

নিমের ঝুরি ধরে একটু দোল খেয়ে নেওয়া যাক, কি বলিস ?

ভারে পট-পট করে সবশুদ্ধ ছিঁড়ে পড়ল মাটিতে।

তার যে একটু চোট না লাগল তা নয়। কিন্তু বেশীক্ষণ আর দাঁড়াল না। চুপি চুপি সদলবলে সরে পড়ল সেখান থেকে।

যথাসময়ে ঘুম ভাঙ্গতেই ভুতি ককিয়ে কেঁদে উঠল।

কিম ভুত চটে গিয়ে বললে, বয়স তো নেহাৎ কম হল না। আর কতদিন পাগলামি করবি?

—সে দুচোখ রগড়াতে বলল, কি সর্বনাশ হল রে রাত্তিরে মাথা থেকে সব চুল চুরি হয়ে গিয়েছে।

—বলিস কিরে? সেও ঝুঁকে পড়ল তার মাথার ওপর। না ভুতি মিছে কথা বলেনি। তার কাঁধে হাত রেখে বললে, এখন কি হবে! শিশিতে তো আর তেল নেই।

দুঃখে ভুতির মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুচ্ছিল না। খালি সে কপাল চাপড়াচ্ছিল।

কিম ভুত কি ভেবে তর্ তর্ করে নেমে এল গাছ বেয়ে। গাছের নীচের কাদায় যেখানে তেলের শিশিটা উলটে পড়েছিল, সেই কাদা খানিকটা হাতে করে নিয়ে এসে ভুতির বেল মাথায় মাখিয়ে দিল। বললে, দেখি কি হয়।

পরের দিন ভুতির মাথায় চুলের চ'ও দেখা গেল না! লাভের মধ্যে তার চকচকে বেল মাথাটা কাদার প্রলেপে কুচকুচে কালো হয়ে গেল।

এক মাথা চুলের স্বপ্ন, স্বপ্ন হয়েই রয়ে গেল ভুতির। চোখ দিয়ে তার টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ল ক'ফোঁটা।

মঙ্গল গ্রহে

আজ ভূতির জন্মদিন। সকাল থেকেই বেশ খুশী খুশী ভাব।

ঘুম থেকে উঠেই সে ছুটল তালপুকুরে ঘা ধুতে। সারাবছর ধুলো মেখে পড়ে থাকে গাছে। এই জন্মদিনেই সে ধুঁ-ধুঁলএর ছাল দিয়ে ঘষে ধুলো তোলে গা থেকে। সুগন্ধি মহুয়ার রস মাখে সারা গায়।

চুনের টিপ পরে, ভ্রূ আঁকে, লিপস্টিক লাগায়।

শ্মশান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া লাল শাড়ী কিংবা গামছা এনে অঙ্গে জড়ায়।

কিম ভূতের বন্ধুরা আসে। নিদেনপক্ষে বনবিড়াল বা কাঠবিড়ালীর মাংস পাতে পড়েই। তাছাড়াও অনেক কিছু। কিন্তু সেবারই প্রথম অঘটন ঘটল। কিম ভূত সেই যে দিন দুপুরে বেরিয়েছিল তারপর আর দেখা নেই। সে না ফিরলে আনন্দ করবেই বা কে! নিমগাছের মগডালে সেজে-গুজে বসে বসে ভূতি গালে হাত দিয়ে ভাবে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। তার এই জন্মদিনটা বুঝিবা বিফলেই গেল!

রাগে-দুঃখে যখন তার দুচোখ ভারী হয়ে উঠেছে, হঠাৎ তেঁতুল তলায় একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। হৈ-চৈটা ক্রমশ সেইদিকেই এগিয়ে আসছে।

ঘটনাটা তার তেমন ভালো লাগল না। বিশেষ করে কিম ভূত তখনও ফেরেনি বলেই মাথার মধ্যে তার নানা রকম দুশ্চিন্তা পাক খেতে লাগল। যেরকম সে গোঁয়ার প্রকৃতির ক'খন কোথায় কি করে বসে তার ঠিক নেই।

তার অনুমান মিথ্য নয়। কিম ভূতকে ধরাধরি করেই আনতে দেখা গেল স্থানীয় কিছু ভূতকে।

অনেক কিছুই মনে হল ভূতির। এক গাছ থেকে পড়ে যেতে পারে, দুই জলে ডুবতে পারে তিন মারপিট করতে পারে… ।

না। কোনটাই নয়। তাকে ধরাধরি করে আনলেও বেশ টনটনে জ্ঞান রয়েছে তার।

নিমগাছের মগডালে তাকে টেনেটুনে তুলে দিয়ে চলে গেল ভূতেরা। ক্রমশ সবকিছুই জানা গেল। শ্মশানে এক সন্ন্যাসী গাঁজা খাচ্ছিল। হঠাৎ সে প্রাতঃকৃত্য সারতে পাশের বনে ঢুকতেই, ভূতের হঠাৎ গাঁজা খাওয়ার সখ প্রবল হয়ে উঠেছিল।

সে আর লোভ সামলাতে পারেনি। গাছ থেকে নেমে গাঁজার কলকেটা সে সরিয়ে ফেলে সেখান থেকে। তারপরে প্রাণভরে গাঁজা টেনে আর দাঁড়াতে পারেনি। গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে সেইখানেই পড়েছিল চিৎপটাং হয়ে।

স্থানীয় কিছু ভূতের হঠাৎ চোখ পড়তে তারাই তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে এতখানি। এখন তার যা অবস্থা শুয়ে থাকা ছাড়া গতি নেই। যে কারণে ভূতির মনটাও খুবই খারাপ হয়ে গেল।

তার সাতশত সাতাত্তরতম জন্মদিনটা যে এভাবে হেলায়-ফেলায় কাটবে সে কখনও ভাবতে পারেনি। সাজগোজ খুলে ফেলবে কিনা যখন ভাবতে শুরু করেছে পূব দিকের আকাশটা হঠাৎ কালো হয়ে এল। আর সেই নিকষ কালো মেঘের সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্ণভেদী শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

এমন শব্দ সে কখনও শোনেনি। তবে শব্দটা যে ঝড়েরই তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ভূতি কিম ভূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, হ্যাঁরা তুই যে গাঁজা খেয়ে পড়ে রইলি আর ওদিকে তুফান আসছে এখন কি হবে?

কিম ভূত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকলেও তার টনটনে জ্ঞান ছিল। মুচকি হেসে বললে, ভূতেরে আবার ভয় পাওয়া মানায় নাকি!

বলতে বলতেই এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি ঝড় এসে পড়ল সেখানে। এমন ঝড় ভূতি আগে দেখেনি। কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, কিম ভূত চল্ গাছ থেকে নেমে পড়ি। এতঝড়ে গাছের ওপর থাকা কি উচিত? যদি ভেঙ্গে পড়ে!

ওই দেখ নিমতলা, বটতলা, বেলতলার সব ভূতেরা গাছ থেকে নেমে পড়েছে।

কিম ভূত আবার মুচকি হাসল। ভাবখানা তার এমন যেন তাদের কোনও বিপদ ঘটতেই পারে না। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ঘটে গেল। সেই ঘূর্ণিঝড়টা এসে আছড়ে পড়ল সেই নিমগাছেরই ওপর। তারপর সেটাকে এক মোচড়ে মাটি থেকে তুলে নিয়ে হু-হু করে শূন্যে উঠতে লাগল।

এতক্ষণে কিম ভূতের গাঁজার নেশা ছুটল। গাছ আঁকড়ে উঠে বসে বললে, ঝড়ের মতিগতি তো ভালো নয়। আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ভূতি ঘাড় নেড়ে বলল, কি করে বলি!

ভূতি ঘাড় নেড়ে বলল, ওদিকে মঙ্গল গ্রহের গায়ে অনবরতই রকেট গিয়ে ধাক্কা মারায় তারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল পৃথিবীর মানুষ সেখানে আসতে চাইছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই ঝড়ের বেগে ভাসতে ভাসতে তারা দুজনে এসে আছড়ে পড়ল মঙ্গল গ্রহের মাটিতে।

নবাগত অতিথিদ্বয়কে দেখামাত্রই দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল সেখানে। আর মুহূর্তের মধ্যেই সে খবর পৌঁছে গেল মঙ্গল গ্রহের মধ্যে।

এদিকে তাদের অবস্থাও সঙ্গীন। এই দীর্ঘপথ উড়ে এসে তারা রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। স্বভাবতই একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। অল্প

সময় বিশ্রাম করার পরেই তারা কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে এবং এদিক সেদিক তাকাতে লাগল।

গ্রহবাসীদের চেহারা অবিকল মানুষের মত নয়। লম্বায় দেড়-হাত থেকে দুহাত। প্রায় বানরেরই মতই গায়ের রঙ পোড়া এবং তামাটে। হাত দুটো লম্বায় হাঁটু ছাড়িয়ে যায়।

পা দুটো খাট। যে কারণে তারা খুব তাড়াতাড়ি চলতে পারে না। তবে সুবিধে সামনে দুটি পায়ের সঙ্গে পিছনেও একটা পা আছে।

দাঁড়িয়ে কাজ করার সময় মোড়া পাটি খুলে দেয়। মাটিতে আর বসার দরকার হয় না।

চোখ-মুখ-কান সবই কয়েকটা গর্তমাত্র। সারাক্ষণ তা বন্ধই থাকে। দরকার মত তা খুলে ব্যবহার করে।

তারা সবাই ভীড় করে দেখছিল কিম ভূত আর ভূতিকে। একজন বললে, এরাই মানুষ, বাঃ ভারী সুন্দর দেখতে তো! তবে শুনেছিলাম ওরা নাকি পোষাক পরে। কি—ন্তু!

তাদের কথা শুনে ভূত-ভূতি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ভূতি বললে, চেপে যা—

ওদের দুজনকে কাঁধে তুলে নিয়ে গ্রহবাসীদের শোভাযাত্রা শুরু হল। এক পাহাড়ে পথ ধরে তারা এগিয়ে চলল।

ভূতি চিমটি কাটল কিমভূতের পিঠে। আমাদের ওরা কোথায় নিয়ে চলল রে।

কিম ভূত ফিস্ ফিস্ করে বললে, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। দেখাই যাক না কি করে।

সুমুখেই এক বিরাট গুহা। তার মধ্যেই মঙ্গলগ্রহের রাজ-দরবার। তারা অতিথিদের কাঁধে নিয়েই ঢুকল তার ভিতরে। গুহার ভিতরে বেশ সাজানো গোছানো। বিচিত্র সব মানুষের মাঝখানে হাজার কোটি বছরের বৃদ্ধ মঙ্গল-রাজ তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছে। শোভাযাত্রা সেখানে পেঁছানো মাত্রই তালপাতার ভেঁপু বাজার মত কী একটা পুঁপুঁ করে বেজে উঠল।

ভূতি একটু ভয় পেল। ফিস্ ফিস্ করে বললে, এখানে আবার কি বাজে রে?

কিম ভূত মুখে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বললে, চুপ আমাদের মানুষ ভেবে সম্মান দেখাচ্ছে—

মঙ্গলরাজ তাদের পরিচয় জানা মাত্রই লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে দিল কর-মর্দনের জন্য। তারপর কাছে ডেকে তাদের দুজনার গালে চুম্বন করল।

পরিচয়ের পালা শেষ হতেই ওদের নিয়ে যাওয়া হল ভোজ সভায়। রঙবেরঙের সব পাথরের প্লেটে থরে-থরে পোকামাকড়ের মাংস সাজানো রয়েছে।

সেখানে গণ্যমান্য মঙ্গল গ্রহবাসীদের সাথে প্রথমে কিম ভূত আর ভূতির পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তারপর ওই পোকামাকড়ের মাংস পরিবেশন করা হল অতিথিদ্বয়কে। খিদের মুখে খেতে মন্দ লাগছিল না তাদের। কিম ভূত তো প্রায় গোগ্রাসেই খেতে শুরু করে দিয়েছিল কিন্তু ভূতিই বাদ সাধল। ইশারায় বলে দিল তাকে সংযমী হবার জন্য।

ভোজসভার পরেও রেহাই নেই। তাদের নিয়ে আবার শোভাযাত্রা শুরু হল সেখান থেকে। সারিবদ্ধভাবে গ্রহবাসীরা দাঁড়িয়েছিল পথের দুধারে। দুহাত তুলে নাচতে নাচতে তারা কিম ভূত আর ভূতিকে স্বাগত জানাতে লাগল।

পথের দুধারে ছোটবড় অসংখ্য পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে বিস্তীর্ণ মরুভূমি।

এই পাহাড় আর মরুভূমি দেখাতে দেখাতে গ্রহবাসীরা তাদের নিয়ে চলল মঙ্গলগ্রহ রাজভবনে। সেখানেই তাদের দুজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

রাজভবনের সবকিছুই রাজকীয় ব্যাপার। পাথর কেটে কেটে দেওয়ালে রকমারি নকশা করা হয়েছে। ঘরের মেঝে ও দেয়াল মসৃণ ও ঝকমকে। এক নজরে দেখলে মনে হয় বুঝি বা পুরোটাই রঙীন কাচের তৈরী।

সুমুখের রাজদরবার পেরোতেই অতিথিশালা। সেখানে সোনার পালঙ্কে মখমলের বিছানা। সুগন্ধে ম' ম' করছে চতুর্দিক। তাদের সেখানে পৌঁছে দিয়ে গ্রহবাসীরা বিদায় নিল।

বিছানায় গা ছোঁওয়াতেই দুজনে ঢুকে গেল সেই নরম তুলতুলে গদীর ভিতর। কিম ভূত বললে, আঃ কী আরাম!

ভূতি বললে, সত্যি বাবা। আর আমি পৃথিবীতে যাচ্ছিনে—

আরামে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তাদের চোখ জুড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড নাসিকা গর্জন শুরু হল।

ঘুমটা বেশ ভালোই হল। ঘুম ভাঙতেই রাজ পরিচারিকারা এসে তাদের অঙ্গমর্দন শুরু করল। এবার ভূতির চেয়ে কিম ভূতই খুশী হল বেশী।

ঘুম চোখেই বললে, আমিও এখান থেকে আর এক পা নড়ছি না।

ইতিমধ্যেই তাদের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হয়েছে। পৃথিবীর অধিবাসী বলে কথা। যে সে ব্যাপার নয়। ভূতি বললে, হ্যাঁরে ভূত সভায় যদি কিছু বলতে বলে তখন কী করব। বক্তৃতার তো ব-ও দিতে পারি না।

কিম ভূত মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, ভাবনার কথা! আমিও কি কি পারি ছাই। যাহোক এখন যে করেই হোক বাঁচতেই হবে। শোন বলি। এই তিন লাইন মুখস্থ কর। দাঁড়িয়েই গড় গড় করে বলতে শুরু করে দিবি—

ভূতি বললে, কী র‍্যা? ভূত একটু হাসল। তুই বলবি, 'ভেরী গুড'। তারপরে বলবি, 'ভারত-মঙ্গল ভাই ভাই'। শেষে বলবি, 'বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক্'। ব্যস্!

ভূতি এই তিনটি লাইন মুখস্থ করতে শুরু করল। মুখস্থ আর হতে চায়না। প্রথম শব্দ মনে থাকে তো শেষটা থাকে না। শেষটা থাকেতো প্রথমটা হারিয়ে যায়। আবার প্রথম আর শেষটা মনে থাকলে মাঝেরটা মনে থাকে না।

ভূতি হতাশ হয়ে বললে, কি করব? কিছুই যে মনে রাখতে পাচ্ছিনা—

কিম ভূত বলে, ঘাবড়াসনি চালিয়ে যা। মনে রাখতেই হবে। অতিথি হয়ে থাকা কি সোজা কথা!

এদিকে যথাসময়েই রাজার লোকেরা এসে হাজির হল। তারা যে অনুমান করেছিল শেষ পর্যন্ত তাই মিলে গেল। এখুনি তাদের সম্বর্দ্ধনা সভায় যেতে হবে।

যথারীতি দুজন মঙ্গলবাসী টান টান হয়ে দাঁড়াল তাদের সামনে। তাদের দুজনকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলল সম্বর্দ্ধনাসভা স্থলের দিকে। ইতিমধ্যে সে খবর রটে যাওয়ায় সভায় তিলধারনের জায়গা ছিল না। ওরা অতিথিদ্বয়কে ঠেলে তুলে দিল মঞ্চের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে করতালিতে মুখর হয়ে উঠল সভাপ্রাঙ্গন।

মঙ্গলবাসীরা যেসব কথা বলল পৃথিবী আর মানুষের নাম উচ্চারিত হল তাতে বার বার।

কিম ভূত আর ভূতিকে যে পৃথিবী থেকে আগত প্রথম মানুষ বলেই ধরেছে তারা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নানারকমের টুকিটাকি উপহারও তুলে দিল তারা তাদের হাতে।

উপহার প্রদানের অনুষ্ঠান শেষ হতে এবার তাদের কিছু বলার পালা। ভূতিকেই প্রথম আহ্বান করল তারা। ইতিমধ্যেই তার পা কাঁপতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিম ভূত বলল, দেখিস পড়ে যাসনি যেন। মানুষ যে এত দুর্বল নয় ওরা ভালো করেই জানে। এখন সসম্মানে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।

ভূতি আরও একটু ঘাবড়ে গেল এবং আরও বেশী করে তার পা কাঁপতে

শুরু করল। কিম ভূতের দিকে তাকিয়ে বললে, কী হবে? আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা যে—

কিম ভূত সবার অলক্ষ্যে হাত বাড়িয়ে তার হাঁটু দুটো চেপে ধরে বললে, তুই দাঁড়া। কেউ দেখতে পাবে না।

এদিকে বক্তৃতা দিতে দেরী হচ্ছে দেখে মঙ্গলবাসী অধৈর্য হয়ে পড়তে শুরু করল এবং মুখে নানারকম বিদঘুটে শব্দ করতে লাগল।

কিম ভূত তার পিঠে একটা চিমটি কেটে বলল, তোর এ কাঁপুনি থামবে না। নে তাড়াতাড়ি শুরু করে দে—

ভূতি শুরু করল বটে কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বক্তৃতা শুরু করার পরেই বাকি দুটি ভুলে গেল।

কয়েকমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে বলে উঠল, ভেরী গুড়…… ভেরী গুড়……ভেরী গু…উ…ড়!

ভূতি নীরব হবার মাত্রই মঙ্গলবাসীরা কি বুঝল কে জানে। খুশীতে সবাই ভুঁয়েতে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

কিম ভূত তার পিঠ চাপড়ে বললে, সাবাস তোর বুদ্ধি!

বিপদ মুক্ত হতে তারা বেশ খুশী মনেই ঘুরে বেড়াল মঙ্গলের মাটিতে।

যথারীতি খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারা গেল আবার সোনার পালঙ্কে মখমলের বিছানায় বিশ্রাম করতে।

কিম ভূত খাটে গড়াগড়ি খেতে খেতে বললে, দাঁড়া আগে গুছিয়ে বসি। তারপর রাজ্যের ভূত-পেতনিদের এই মঙ্গল গ্রহে নিয়ে আসব।

ভূতি বিছানায় পা ঘষতে ঘষতে বললে, তুই রাজা হলে আমাকে রাণী করতে হবে। নইলে—। কল্পনার আনন্দে যখন তাদের দুই চক্ষু জুড়ে এসেছে হঠাৎ বাইরে থেকে একটা কর্কশ ইঞ্জিনের গর্জন ভেসে আসতে লাগল।

ওদের দুজনেরই খুশীর আমেজ কেটে গেল। ভূতি বললে, কি ব্যাপার বলত, এখানে আবার ইঞ্জিনের গর্জন আসছে কোত্থেকে?

কিম ভূত বললে, ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। দাঁড়াতো দে—খি ব্যাপার-খানা কি!

সামনেই একটা সোনালী পাহাড়। কাঁচা সোনার তাল দিয়ে সেটা তৈরী।

সে তর্ তর্ করে উঠে পড়ল তার ওপর। বড় বড় চোখ করে বললে, একি কাণ্ড! সমস্ত মঙ্গলগ্রহবাসী যে দল বেঁধে ছুটছে! সকলের মুখেই এক কথা 'রকেট! রকেট! রকেট'!

কিম ভূত ছুটে এসে বলল, ভূতি সর্বনাশ হয়েছে। একটা রকেট নেমেছে

মঙ্গলের মাটিতে। এর ভেতরে যদি মানুষ থাকে আমাদের সব পরিচয়ই ফাঁস হয়ে যাবে। আর অত সম্মান জুটবে না কপালে! মিথ্যে পরিচয় দেওয়ার জন্য আমরা এমনকি মারধোর পর্যন্ত খেয়ে যেতে পারি। তারচেয়ে আগে থাকতেই পালাই চ'—

ভূতি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, তাই 'চ'—। বলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা দুজনে লাফিয়ে পড়ল সমুখের কাচের জানালা দিয়ে। এবং এক কোটি ছাপান্ন মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে নামতে শুরু করল।

বদহজম

ক'দিন ধরেই কিম ভূতের পেট ভুটভাট করছে। কিছুই হজম হচ্ছে না। যা খাচ্ছে তাতেই চোঁয়া ঢেকুর উঠছে। আমড়াতলার কদুবদ্যির কাছে গিয়েছিল সে।

কদুবদ্যি তার পেট টিপে বলেছে পিলে বেড়েছে। সাবধানে থাকতে হবে। হাতী ঘোড়ার মাংস খাওয়া চলবে না। সাপ ব্যাঙ চলতে পারে। তাও পরিমাণ মত।

কদুবদ্যি যখন কথাগুলো বলেছিল তখন কিম ভূত খুব ঘাড় নেড়েছিল। বলেছিল, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। কিন্তু আড়াই পা না পেরোতেই সব ভুলে গেল। লুকিয়ে লুকিয়ে আবার সে সবকিছু চালাতে লাগল।

কিম ভূতের পিলে বাড়লে মুস্কিল হয় ভূতির। সব সময়েই মেজাজ খিটখিটে। চুণ থেকে পান খসলে আর রক্ষে নেই। চীৎকার চেঁচামেচিতে বন মাত করে দেবে।

অকারণে ভূতির ওপর রাগ তো ঝাড়বেই। তাছাড়াও আশে পাশের গাছের ভূত-পেতনির সাথে গায়ে পড়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবে।

তা নিয়েও মাঝে মাঝে কম ঝক্কিও পোহাতে হয়না ভূতিকে। কিম ভূতের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তারা নালিশ করে ভূতির কাছে।

কেউ কেউ আবার মারধোরেরও ভয় দেখায়। কিন্তু ভূতির চিরকালই মাথা ঠাণ্ডা। তাদের বুঝিয়ে-বাজিয়ে সে ফেরৎ পাঠায়।

অন্যান্যবার এটা ওটা করতে করতেই সেরে ওঠে ভূত। দুচারদিন সাবধানে থাকে। তারপর যথারীতি। ক্রমশ ভুলে যায় রোগের ঘটনাটা।

কিন্তু এবারে আর সারার নাম নেই। কদুবদ্যি হাল ছেড়ে দিতে এক এক করে লেচি, ঘুটু, মুতকো ইত্যাদি সকলেরই চিকিৎসা করানো হল। কিন্তু কোনই লাভ হল না।

যে ব্যামো ধরেছিল সে ব্যামোই রয়ে গেল।

ভূতি দেখল, এ কঠিন ব্যামো সহজে সারার নয়। শেকড় মেকড়ে যখন কাজ হল না, দৈবচিকিৎসার কথা পাক খেতে লাগল মাথাতে।

একে ওকে যাকেই জিজ্ঞাসা করে সকলেই বলে বাবা কুটকুটেশ্বরের কথা। শ্মশানের গায়ে যে ভাঙ্গা মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরের ভেতরেই বাবা কুট কুটেশ্বরের বিগ্রহ আছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর এই তিন দেবতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুড়ে হয়েছে বাবা কুটকুটেশ্বরের মূর্তি।

প্রতি শনিবার রাজ্যের ভূত-পেতনি এসে সেখানে ভীড় করে। বাবা সদয় হলে সব বিপদ কেটে যায়। তার আর রেশ থাকে না।

বিপদ বলতে অবশ্য রোগ ছাড়া আর কিইবা আছে।

কিম ভূতের দুর্দশা দেখে ভূতি আর সহ্য করতে পারে না। রাতারাতি গিয়ে ধর্ণা দিল সেই মন্দিরে। দূর দূরান্ত থেকে আগত রোগীরা তখনও কেউ এসে পৌঁছায়নি।

ভূতি রীতিমত ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ তুলেই মাথা খুঁড়তে লাগল বাবার শ্রীচরণে। বলতে লাগল আমার ইচ্ছে যদি পূরণ না কর এখানেই আমি শয্যা নেব। এক চুল আর নড়ব না।

যত সহজে সে কার্যোদ্ধার করবে ভেবেছিল তত সহজে হল না। আর তার আকুল আবেদন বাবার কর্ণগোচরও হল না!

ভূতিও ছাড়বার পাত্র নয়। মাটি কামড়েই সে পড়ে রইল মন্দিরে। একটা ফয়সালা না করে সে যাবে না এক পাও।

ওদিকে বাবা কুটকুটেশ্বরের সর্বত্রই লক্ষ্য ছিল। ভূতির মতই এমন হাজার হাজার পেতনি প্রায় এসে ধর্ণা দেয় তার মন্দিরে। উদ্দেশ্য সকলের একটাই। বিপদ থেকে বাঁচাও!

তাই সহজে নরম হন না। তবে ভূতির জিদ দেখে শেষপর্যন্ত বাবা কুটকুটেশ্বর গলতে শুরু করলেন। সশরীরে ভূতির মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তোর ভক্তি দেখে আমি খুশী হয়েছি। হ্যাঁ, এখন বল আমায় কি করতে হবে? কী করলে তুই খুশী হস্‌!

ভূতি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল। এত তাড়াতাড়ি যে বাবার দেখা পাবে সে ভাবতেই পারেনি।

সে হাতজোড় করে বললে, বাবা কিম ভূতের জ্বালায় আর বাঁচিনে। আগড়ুম বাগড়ুম খেয়ে খেয়ে লিভারের লালবাতি জ্বালিয়েছে। হাতী ঘোড়া খেলেই এখন পেট ভুটভাট করে চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। গা বমি বমি করে।

কিছুতেই আর সামলাতে পাচ্ছে না। রাজ্যের বৈদ্যকে দেখিয়েছে। গাছের শিকড় চুষে চুষে তো জিভের ছাল উঠে গিয়েছে। কিন্তু সারার নামগন্ধ নেই।

ওর পেট না সারলে আমার বাসায় টেকা দায়। ওর হজমশক্তিটা একটু মন্ত্রবলে ঝালাই করে দাও। যাতে ও আগের মতোই গবগবিয়ে যা খুশী খেতে পারে।

ভূতি সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাল বাবা কুটকুটেশ্বরের মুখের দিকে।

বাবা এতক্ষণ খালি ঘাড় নেড়েই যাচ্ছিলেন। ভূতির সব কথা শুনছিলেন

নাকি শুনছিলেন না বোঝার কোনও উপায় ছিল না।

হঠাৎ একঝলক মুচকি হেসে বললে, ওষুধ বলার আগে একবার পাকস্থলীটা দেখা প্রয়োজন। আগে নাড়ি টিপলেই দেখতে পেতাম। এখন বয়স হয়েছে আর পারিনে।

আমার বারটা বেজে গিয়েছে। তবে যখন বলছিস একটা হজমি মন্ত্র বলে দি। কিম ভূত যখন হাঁ করে ঘুমোবে তুই কানের কাছে গিয়ে এই মন্ত্রটা আউড়াবি।

মন্ত্রটা ঢোকামাত্রই কানের পাতাটা বন্ধ হয়ে যাবে। পাঁচমিনিট অপেক্ষা করবি। দেখবি ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎই ফাঁক হয়ে যাবে। আর সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবে একটা গোল রবারের বলের মত বস্তু। অর্থাৎ ওর পাকস্থলী।

তুই থলে ভরে সেটা নিয়ে সাবধানে আসবি আমার কাছে। দেখে শুনে আমি কি ব্যারাম হয়েছে বলে দেব এবং কি খেলে সারবে তাও জানিয়ে দেব।

প্রস্তাবটা শুনে ভূতির কেমন একটু হাসি পেল। কিন্তু হাসল না। গম্ভীরভাবে বলল, মন্ত্রটা কি শুনি।

বাবা কূটকুটেশ্বর চোখ বুজে একমিনিট ধ্যান করল। ধ্যান শেষ হতে থর-থর করে কাঁপতে শুরু করল তার তেজপাতার মতো ঠোঁট দুটো।

তান্ডং মান্ডং তিরি-তিরি চায়
গুলগুলি গুলু গুলু চিকি-চিকি খায়।

মন্ত্র উচ্চারণ করে বাবা মৃদু হাসলেন।

ভূতির মনে মনে খুবই আনন্দ হল। কিন্তু মুস্কিল হল তার স্মৃতিশক্তি নিয়ে। এই দু-লাইন মন্ত্র স্মরণে রাখা তার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ল।

কুটকুটেশ্বর সেটা বুঝতে পেরেই বললেন, বলতে বলতে বাসায় যা। তাহলেই মনে থাকবে। মুখস্থও হয়ে যাবে।

তার উপদেশ মেনেই সে এগুতে লাগল তার বাসার দিকে।

ওদিকে খাওয়া বন্ধ হতে মনে একেবারেই সুখ নেই কিম ভূতের। গত তিনদিন সে অবিরাম ঘুমোচ্ছিল। সবাই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করেও নামাতে পাচ্ছিল না তাকে গাছ থেকে।

ইতিমধ্যেই ভূতি বিড়বিড় করতে করতে ফিরে এল গাছেতে। তবে ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে। কিম ভূত খাওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে হাঁ করেই শুয়েছিল।

ভূতি দেখল এই সুবর্ণ সুযোগ। তাকে জাগিয়ে এসব কাজ করা যাবে না। আর একবার যদি মাথাগরম হয়ে যায় তাহলে তো আর রক্ষেই নেই। বাবা কুটকুটেশ্বরেরও শ্রাদ্ধ হয়ে ছাড়বে।

সে তার মাথার কাছে হাঁটু ভেঙ্গে বসল। তার কানের ওপর ঝুঁকে পড়ে

ওই মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল।

একবার। দুবার। তিনবার—এ কাজ হল। হঠাৎ একটা ছাই ছাই রঙের গোলাকার নরম বস্তু বুলেটের মত বেরিয়ে এল তার পেটের ভিতর থেকে এবং সরাসরি তার হাতে ঠক করে পড়ল। এমন একটা কাণ্ড ঘটল ঘুমন্ত কিম ভূত কিন্তু কিছুই টের পেল না।

ভূতি সেটা সযত্নে বট পাতা দিয়ে মুড়ে নিল। তারপর থলেতে পুরে দৌড়াল বাবার মন্দিরে।

ঘুম ভাঙ্গতে কিম ভূত কিন্তু একটু অবাকই হল। তার পেটটা ভীষণ খালি খালি মনে হচ্ছে। সে ভাবল এটা কদিন না খাওয়ারই ফল। কদিন তো সে অন্নজল স্পর্শ করেনি।

মনের আনন্দে সে গান ধরল।

আবার সে হাতী ঘোড়া খেতে পারবে সেটা কি কম কথা। কদিন না খাওয়ার জন্যই বোধহয় খিদেটা তার আরও বেড়ে উঠেছে।

গাছের তলা দিয়ে মক্কা যাচ্ছিল। দুটো কালো ঘোড়ার ঠ্যাঙ নিয়ে। কিম ভূতকে গাছের ওপর গাইতে দেখে একটা ঠ্যাঙ বাড়িয়ে দিয়ে বললে, গুরু চলবে নাকি ?

কিম ভূতের মাথায় খাবার চিন্তাই ঘুরছিল। মুখের সামনে তা বাড়িয়ে দিতে আর লোভ সামলাতে পারল না। হাত বাড়িয়ে একটা টেনে নিয়ে বলল, অনেকদিন ঘোড়ার ঠ্যাঙ খাইনি। একখানা বাড়া দেখি—

টাটকা ঘোড়ার মাংস। ভালোই লাগছিল খেতে। প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেটা চালান করে দিল পেটের মধ্যে।

কিন্তু পরিণাম ভালো হল না। যতটুকু খেল ততটুকুই বেরিয়ে গেল পিছন দিয়ে।

দেখেশুনে তো কিম ভূতের চক্ষুস্থির। যা খায় তাই-তো সঙ্গে সঙ্গে বেরোয়নি কখনও। কিছুটা ঘাবড়েও গেল সে।

দৌড়াল সে কদুর বাসায়। কদু বসে ঝিমুচ্ছিল। রোগী আসার নাম নেই সকাল থেকে। কতক্ষণ আর বসে বসে মাছি তাড়াবে সে।

ইতিমধ্যে কিম ভূতের উপস্থিতি তার আনন্দের কারণ হল। বলল, ভালোই তো ছিলিস আবার কী হল ?

কিম ভূত ঘটনাটা হুবহু বলতে কদু বদ্যির তো চক্ষু চড়কগাছ। বলে, সেকি র‍্যা, তোর নাড়িভুড়ি কোথায় গেল ?

সে ঘাড় নাড়ল। তাতো জানিনা। পেটের মধ্যে থেকে আর কোথায় যাবে !

কদু গম্ভীর হয়ে বলল, তোর কি হাঁ করে ঘুমানো অভ্যেস ?

অভ্যেস নয়। ঘুমানোর সময় মুখ বুজিয়েই ঘুমোই। পরে মুখ খুলে যায় বলেই শুনেছি।

হুম্‌ তাহলে আমার অনুমানই ঠিক। চুরি গিয়েছে। ওই সুযোগে কেউ হয়তো পেটের ভিতর আঁকশি বাড়িয়ে ওটা বার করে নিয়েছে।

এখন তো তোকে বাঁচানোই কঠিন সমস্যা দেখছি।

কিম ভূত পিন্‌ পিন্‌ করে কেঁদে উঠল। কম করেও এখন হাজার পাঁচেক বছর তার বাঁচার কথা। এরই মধ্যি!

খবরটা ভূতিকে জানানোর জন্যই সে ছুটে গেল গাছে। কিন্তু তখনও সে ফেরেনি।

মনের দুঃখে সে গাছে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

যথারীতি তার ঠোঁট দুটো আবার ফাঁক হয়ে গেল।

ওদিকে ভূতি আগের দিন যত সহজে বাবা কুটকুটেশ্বরের দর্শন পেয়েছিল সেদিন আর পেল না। বসে বসে কোমর শক্ত কাঠ হয়ে গেল তার।

বাবার পুজো দিতে এসেছিল যারা একে একে পুজো সেরে চলে গেল তারা।

একা আর কতক্ষণই বা বসে থাকা যায়—ভূতির বসে বসে ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মন্দিরে আবির্ভাব ঘটল বাবা কুটকুটেশ্বরের।

ভূতির দিকে তাকিয়ে বলল, কিরে এনেছিস?

'হুম' বল ভক্তি অবনত মাথা নাড়ল সে।

কই দে—খি—

সে বটপাতার মোড়কটা তুলে দিল তার হাতে।

কুটকুটেশ্বর সেটা ফুঁ দিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল। তারপর সেটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে প্রায় ক্রিকেটের ক্যাচ লোফার মতোই ধরে নিয়ে বললে, না তেমন কোনও দোষ দেখছি না!

দোষের মধ্যে এর ভিতরের নালিটাই বন্ধ হয়ে গেছে। তাই খাবার চলাচল করতে পাচ্ছে না। বদহজম হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় বুড়ো হাতী ঘোড়ার মাংস খেতে গিয়েই বিপত্তিটা ঘটেছে।

লেজের একগোছা চুল এর ভিতরে আটকে রয়েছে। ওটা বার করে ফেলতে পারলেই রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

দাঁড়া আমিই হজম চালু করে দিচ্ছি। এই বলে সে বাঁশ ঝাড় থেকে একটা তুলতুলে নরম কচি বাঁশ তুলে এনে ঢুকিয়ে দিল তার মধ্যে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা চুক করে শব্দ হল।

কুটকুটেশ্বর তার হাতে সেটা দিয়ে বলল, যা এটা নিয়ে যা। কিম ভূত

যখন হাঁ করে ঘুমোবে, ওর হাঁ বরাবর এটা ধরে টুক্ করে ছেড়ে দিবি। ব্যস, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভূতির আর অপেক্ষা সইল না। তখনই সে দৌড়াল।

বাসায় পেঁৗছে তর্ তর্ করে সে উঠে গেল গাছের মগডালে। কিম ভূত তখন হতাশ হয়ে হাঁ করেই ঘুমোচ্ছে।

একমুহূর্ত দেরী করল না সে। কুটকুটেশ্বরের নির্দেশ মতোই সেটা ফেলে দিল তার মুখে। সরাৎ করে সেটা নেমে গেল গলা বেয়ে। খটাং-খট্ করে আটকে গেল মাঝ পেট বরাবর। কিম ভূত কিন্তু এসব কিছুই টের পেল না। সে নাক ডাকিয়েই ঘুমোতে লাগল।

বেশীক্ষণ আর ঘুমোতে পারল না। তিনদিনের জমা ক্ষিদে কম নয়। তাছাড়াও পাকস্থলী পরিষ্কার করার দরুণ পেটের মধ্যে খিদেতে চোঁ-চোঁ শব্দ হতে লাগল।

কিম ভূতের ঘুম ভাঙ্গতে গদ-গদ হয়ে বললে, ভূতি ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। শিগ্গীরি ভালো খাবার দাবার নিয়ে আয়।

ভূতি তৈরীই ছিল। একজোড়া বুনো মোষের ঠ্যাঙ তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, নে খা। কিম ভূত মনের সুখে মোষের ঠ্যাং চিবোতে লাগল।

ভূতি নীরবে বাবার শ্রীচরণে মাথা ছোঁয়াল।

ভূতি বিশ্বাস করে না কিম ভূত প্রতিদিন নিজের হাতে হাতী ঘোড়ার ঘাড় মটকে মাংস নিয়ে আসে খাবার জন্যে।

তার ধারণা বনে জঙ্গলে বাঘ সিংহীতে যেগুলো না খেয়ে ফেলে দিয়ে যায়, কিম ভূত সেগুলোই কুড়িয়ে এনে ভূতির কাছে ফুটুনি করে। বলে, আজ এই হাতীটাকে স্রেফ চিমটি কেটে মেরেছি কিংবা ঘোড়াটার লেজ ধরে এমন আছাড় মারলাম যে বাছাধন মরবার আগে একবার চিঁ ডেকে আর হিঁ বলবার ফুরসৎ পায়নি ইত্যাদি।

ভূতি কিম ভূতের কথা একবর্ণ বিশ্বাস না করলেও তার গুল ধরবার মত কোনও পথ জানা ছিল না। অগত্যা সে নীরবে খালি শুনেই যেত। আর এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল তাদের সুখের দিনগুলো।

একদিন ভূতি গাবতলার কোনও এক ভূতের বীরত্বের গল্প করছিল তার কাছে। গল্প করতে করতে সে বলল, তোর গায়ে আর কি জোর। জোরের মত জোর দেখালো বটে আজ ওই গাবতলার চিমটে ভূত।

ভূতির মুখে গাবতলার চিমটে ভূতের প্রশংসা শুনে কিম ভূত কিন্তু একটুও খুশী হল না। বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বললে, যেমন শুনি—

ভূতি বললে, তুই যখন বেরিয়ে গেছলিস, কোত্থেকে একটা পাগলা হাতী বনে ঢুকে পড়ে শুঁড় দিয়ে গাছপালা সব ভেঙ্গে তচ্‌নচ্ করছিল।

পাগলা হাতীর ভয়ে, কচি কাঁচা বাচ্চাদের কাঁধে পিঠে নিয়ে যখন ভূতিরা প্রাণের দায়ে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করছিল, তখন চিমটে গাছ থেকে নেমে, দুবার বুক চাপড়ে, হাতীর শুঁড়টা ধরল। তারপর বাঁই-বাঁই করে দশপাক ঘুরিয়ে এত জোরে ওপরে ছুঁড়ে দিল, খালিচোখে আমরা আর তাকে দেখতে পেলাম না। শূন্যে মিলিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম খুব উঁচু দিয়ে একটা গোদা চিল হাতীটাকে মুখে করে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে পশ্চিমদিক বরাবর। আমরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এবং চিমটের পিঠ চাপড়ালাম।

কিম ভূত দিল্লীকা লাড্ডুর মত গোল গোল চোখ করে বলল, সত্যি বলছিস? ও এত শক্তি ধরে বলে তো আগে কখনও শুনিনি।

ভূতি বললে, সত্যি না তো কি। হয়তো বা এই সুযোগের জন্যই এতদিন সে অপেক্ষা করছিল। 'হুম' বলে কিম ভূত অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। এ ঘটনাও তারা ভুলেও গিয়েছে।

সেদিন বেরুবার সময় কিম ভূত বললে, ভূতি আজ আমার একটু ফিরতে দেরী হবে। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়িস। অযথা ভাবিসনি যেন।

ভূতি বললে, কেনরে? হঠাৎ তোর মুখে এ কথা!

কিম ভূত বললে, একটা ছুরি যোগাড় করতে হবে!

ভূতি একটু অবাক হয়ে বললে, ছু-রি! ছুরি দিয়ে কি করবি? আমাকে কাটবি নাকি? সে তার ফাঁপা বুকখানা ব্যাঙফোলা ফুলিয়ে বলল, অনেকদিন গণ্ডার শিকার করিনি। ভাবছি কাল বনে গণ্ডার শিকার করতে যাব।

তা ছুরি দিয়ে গণ্ডার মারবি নাকি? ভূতি বড় বড় চোখ করে ভূতের মুখের দিকে তাকাল। সে মুচ্কি হেসে বললে, না এমনি নিয়ে যাব। কাজে লাগতেও পারে আবার নাও পারে।

ভূতি একমিনিট থ' মেরে কিম ভূতের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে বলল, আমি কোনদিন শিকার করা দেখিনি। ভাবছি তোর সঙ্গে যাব। স্বচক্ষে দেখব ব্যাপারটা কিরকম।

ভূতির এই বদ আবদার শুনে কিম ভূত কিন্তু মোটেই খুশি হল না।

তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বলল, তুই আবার কোথায় যাবি? বনে জঙ্গলে কখন কি বিপদ হয় কিছু বলা যায় না।

সখ মেটাতে গিয়ে দুজনেই মারা পড়ব! ভূতি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললে, কিচ্ছু বিপদে পড়বি না। গুরুর নাম নিয়ে বেরুব। বিপদে পড়লে তিনিই রক্ষা করবেন।

কিম ভূত দেখল সে যখন একবার জিদ ধরেছে, কিছুতেই আর তাকে রোখা যাবে না। মিছিমিছি অশান্তি বাড়বে। তারচেয়ে সাথে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

অগত্যা ভূতিকে সঙ্গে নিয়েই কিম ভূত শিকারে যেতে রাজী হল।

সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই ভূতি সহ সে বেরুল শিকারে। পথে যেতে যেতে নানা রকমের জীবজন্তু চোখে পড়তে লাগল তাদের।

ভূতি বললে, ওরে ভূত মার। হাঁ করে দেখছিস কি?

কিম ভূত বললে, ধ্যাৎ কী মারব। এসব ছেলেবেলায় শিকার করতাম। হাতী গণ্ডার চোখে পড়লে বরং বলিস—তারজন্যই হাতটা তখন থেকে হিস-পিস করছে।

ভূতি আর কি বলবে। সত্যিই এখনও পর্যন্ত একটা গণ্ডার চোখে পড়েনি। সে নীরবে তার পিছন পিছন চলতে লাগল।

প্রায় তিনদিন তিনরাত অবিরাম চলার পর হঠাৎ ভূতির চোখে একটা গণ্ডার পড়ল।

ভূতি আনন্দে অধীর হয়ে, কিম ভূতের পিঠে একটা চিমটি কেটে বলল, গণ্ডার, মা—র!

কিম ভূত হঠাৎ চমকে উঠে, হাতের আঙ্গুল দুটো গোল করে চোখে ঠেকিয়ে কি যেন দেখল। তারপর ভূতির পিঠে একটা তিনকিলো ওজনের থাপ্পড় কষিয়ে, পিঁক পিঁক করে হাসতে হাসতে বলল, দূর একেবারে বা—চ্—চা! এত কচি মেরে কি আর হাতের সুখ হয়। কিম ভূত হাসতে হাসতে তার হাতের গুলিটা একবার টিপে দেখে নিল।

কিম ভূতের হাবভাব দেখে ভূতির চক্ষুতো ছানাবড়া। এই যদি কচি গণ্ডারের নমুনা হয় তাহলে দামড়া নাজানি কি!

তার নির্দেশ মতো ভূতি আবার চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পথ চলতে লাগল।

বাঘ, সিংহ, হাতী, কুকুর, বেড়াল, ছুঁচো, ইঁদুর, টিকটিকি, আরশুলা ইত্যাদি সবকিছুই চোখে পড়তে লাগল একমাত্র গণ্ডার ছাড়া।

তার অবশ্য সেজন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। সে বেশ খুশি মনেই হেঁটে চলেছে।

বেশ কিছুটা পথ হাঁটার পর হঠাৎ ভূতি 'পেয়েছি' বলে চীৎকার করে ওঠে। কিম ভূত বললে, আবার কি পেলি?

ভূতি তার হাতটা ধরে বাঁশবনের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে দেখাল, দূরে একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার দাঁড়িয়ে জুল-জুল করে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে।

গণ্ডার দেখেই কিম ভূত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

ভূতি বললে, এটা কিন্তু বাচ্চা নয়। তুই যা খুঁজছিলিস তাই।

কিম ভূত আবার চোখে আঙ্গুল লাগিয়ে খুব নিবিষ্ট মনে কি যেন নিরীক্ষণ করল, তারপর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, না কপালটা নেহাৎই মন্দ।

এটা আবার থুড়-থুড়ে বুড়ো। বুড়ো গণ্ডারের গায়ে হাত দেওয়া ঠিক নয়।

গণ্ডারটা বুড়ো শুনে ভূতির মুখ শুকিয়ে গেল।

এই দীর্ঘ পথ হাঁটার ফলে দেহে ক্লান্তি নেমেছে। মাথাটাও ধরেছে। পায়ের ডিমদুটো টন্‌টন্‌ করছে।

কিম ভূতের শিকার দেখবার ইচ্ছে আর তার একটুও নেই। কিন্তু সে কথা প্রকাশ পেলে পাছে তার গুমোর বেড়ে যায় এই ভয়ে ভূতি গুটি-গুটি তার পিছনে চলতে লাগল।

বাঁশবনের মধ্যে আরও খানিকটা এগুতেই হঠাৎ সামনের ঝোপটা নড়ে উঠল

ওর পিঠে একটা চিমটি কেটে বলল, গণ্ডার, মা—র।

কেঁপে। ভূতি থমকে দাঁড়িয়ে বললে, হ্যাঁরা কী ব্যাপার বলত ?

কিম ভূত বললে, ভালো মনে হচ্ছেনা। যোয়ান গণ্ডারগুলো সাধারণত এইভাবেই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

তুই এক কাজ কর। আমার সঙ্গে না গিয়ে তুই ওই লম্বাবাঁশ গাছটায় চড়ে বসে থাক। আমি বরং ওকে মেরে নিয়ে আসি।

ভূতি বললে, কেন, আমি গেলে কি হয়েছে ?

কিম ভূত বড় বড় চোখ করে বলল, তোর সাহসতো কম নয়।

যদি গণ্ডারটা একবার ক্ষেপে গিয়ে তাড়া করে, তুই ওই ঝোপের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে পালাতে পারবি ?

ভূতি কি যেন বলতে যাচ্ছিল—

কিম ভূত বাধা দিয়ে বলল, যা বলছি তোর ভালোর জন্যেই বলছি।

ভূতি আর কি করে, গুটি-গুটি ওই বাঁশগাছে উঠে বসল।

কিম ভূত ঢুকল বাঁশঝাড়ের মধ্যে।

ভূত তার মধ্যে ঢুকে দেখল একটা হরিণ লতায় শিঙ জড়িয়ে যাওয়াতে মুক্ত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে আর তারজন্যেই ঝোপটা ভীষণ কাঁপছে।

কিম ভূত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, হরিণটাকে মুক্ত করে দিয়ে এমনভাবে দৌড়াতে শুরু করল যাতে ভূতি বুঝতে পারে সে গণ্ডারটাকে মারবার জন্য তাড়া করেছে।

কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ কিম ভূত দেখল সুমুখে একটা জলার ধারে, একটা মরা ছাগল পড়ে আছে। সম্ভবত বাঘে মেরে ফেলে রেখে গেছে।

কিম ভূত পকেট থেকে ছুরিটা বার করে ছাগলটার ছাল ছাড়িয়ে ফেলল। পা চারটে আর মুণ্ডুটা কেটে বাদ দিয়ে বাকী ধড়টা টানতে টানতে নিয়ে এল ভূতির কাছে। বললে, এই দেখ গণ্ডার মেরে এনেছি।

ভূতি বলল, অত বড় গণ্ডারের এইটুকু ধড় হয় নাকি।

কিম ভূত হেসে বলল, তা আর হবে না, ওদের চামড়াতো তিনফুট পুরু। চামড়া ফেলে দিলে ভেতরে আর কি থাকে ?

ভূতির চোখদুটো রাজভোগের মত গোল গোল হয়ে উঠল।

কিম ভূত সগর্বে মুচকি হাসতে হাসতে বললে, এই নিয়ে আমার হাজার একটা গণ্ডার মারা হল।

শুনে ভূতি একটা কঁক্ করে ঢোক গিলল মাত্র। তার মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরুল না।

মাছ ধরা

চিঁচু ভূত একহাতে ছিপ আর একহাতে একটা একিকলো ইলিশমাছ নিয়ে শ্মশানের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল।

কিম ভূত ভূতিকে ডেকে বললে, দ্যাখ চিঁচু কিরকম বুক ফুলিয়ে যাচ্ছে।

একটা কচি ইলিশের বাচ্চা ধরেই এত অহঙ্কার, আমার মত পাঁচ মণ ইলিশ ধরলে তো না জানি কী করত।

ভূতি চিঁচুকে দেখছিল। চিঁচু সব ব্যাপারেই একটু চালবাজি করে।

কিম ভূত পাঁচ মণ মাছধরার কথা বলতেই, সে টেরা চোখে ভূতের দিকে তাকিয়ে বললে, তুই আবার পাঁচ মণ ধরলি কবে রে?

তোর সঙ্গে আমার বে হবার পর থেকে আজ এই প্রথম শুনলাম তুই মাছ ধরতে পারিস।

ভূতির কথা শুনে সে একটু থতমত খেয়ে বললে, তোকে তো আসল গপ্পটাই বলা হয় নি।

ছেলেবেলায় আমার ভীষণ মাছ ধরার নেশা ছিল। দিনরাত ছিপ বগলে নিয়ে ঘুরতাম। আর মণ-মণ মাছ ধরতাম।

কিম ভুতের কথা শুনে ভূতির চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল। খিঁক করে হেসে বললে, ছিপ দিয়ে মণ-মণ মাছ ধরতিস। আমাকে কি তুই গাঁইয়া পেয়েছিস যে যা বোঝাবি তাই বুঝব।

কিম ভূত বললে, সত্যি বিশ্বাস কর। তোর কানের মাকড়ি ছুঁয়ে বলছি।

সেদিন সকাল থেকেই টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

কিম ভূত পেকাটির ধোঁয়া খেতে খেতে বললে, এইরকম বৃষ্টির দিনেই মাছ ধরে সুখ। গব গব করে মাছ টোপ গেলে।

ভাবছি ছিপটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ব কিনা।

ভূতি যেন এর জন্যই অপেক্ষা করছিল।

সে মাছ ধরতে যাবার কথা তুলতে ভূতি বললে, আমিও তোর সাথে যাব। একা থাকতে ভালো লাগে নাকি?

তার এই আবদার শুনে কিম ভূত কিন্তু মোটেই খুশি হল না।

বিরক্ত হয়ে বললে, তুই আবার কোথায় যাবি। এই বৃষ্টি মাথায় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চারে বসে থাকা কি মুখের কথা।

এসব আমাদের শরীরেই সহ্য হয়। কিমভূত হাত দুটো ভাঁজ করে বুকটা

একবার ফোলাবার চেষ্টা করল।

ভূতি ছাড়বার পাত্র নয়।

রেগে যাওয়ার ভান করে বললে, তুই যদি আমায় মাছ ধরতে না নিয়ে যাস এই গাছের তলায় আমি অনশন করব। যার ফল কি হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস!

ভূতির কথা শুনে তো কিম ভূতের আক্কেল গুড়ুম।

সে বুঝতেই পারল, ভূতিকে নিয়ে যেতেই হবে। তা নাহলে সে তাকে গাছে টিকতে দেবেনা।

সে ভূতির মাথায় ফুঁ দিতে দিতেই বললে, দোহাই মাথা গরম করিসনি। সাতসকালেই মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ব।

কিম ভূত মটকা মেরে মগডালে শুয়ে ছিল।

ভূতি সাতসকালে উঠে তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বললে, কীরে শুয়ে আছিস যে বড়। মাছ ধরতে যাবিনে?

কিম ভূত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসল।

ভূতিকে বললে, তুই ততক্ষণ ছিপ আর ঘুঘুপাখীর ডিমগুলো বেঁধেসেধে নে। আমি আলিস্যিটা ছাড়িয়ে শরীরটা ঝরঝরে করে নিই।

ঘুঘুপাখীর ডিম আর ছিপ নিয়ে কিম ভূত ভূতিকে নিয়ে বেরুল মাছ ধরতে। সাথে একটা মাছের জালিও নিল।

ভূতি বললে, হ্যাঁরে ভূত কোত্থেকে মাছ ধরবি ঠিক করেছিস!

সে গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল আপাতত ঠিক আছে নবডঙ্কা ঝিল থেকে।

ভূতি বলল, নবডঙ্কা ঝিল! ও নামে আবার কোনও ঝিল আছে নাকি? শুনিনি তো কখনও—

কিম ভূত হাসল। মাছ খাস আর মাছের জন্মভূমির নাম শুনিস নি।

এই যে খাল-বিল-নদী-নালা-পুকুরে মাছ কিলবিল করছে, এরা সব এলো কোত্থেকে?

নবডঙ্কা ঝিল সব মাছের জন্মভূমি।

নবডঙ্কা ঝিলে মাছের চোদ্দ পুরুষের বাস। পাঁচ-দশমণি মাছও ওখানে পাওয়া যায়।

স্বচক্ষে দেখবি কি জিনিষ।

কিম ভূতের সাথে পাল্লা দিয়ে তিনদিন তিনরাত কখন হেঁটে কখনও দৌড়ে ভূতি ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

কিম ভূতকে সে বললে, আর কত পথ রে ?

সে মিটকে মিটকে হাসতে হাসতে বললে, এই তো এসে গেলাম বলে। ওই তো নবডঙ্কা !

সাতদিন অবিরাম হাঁটার পর অবশেষে তারা নবডঙ্কা ঝিলে যখন পৌঁছল সূর্য সবে মাত্র অস্ত গিয়েছে।

ভূতি বলল, এখনই চার ফেলবি নাকি ?

কিম ভূত বললে, ধ্যুৎ, মাছেদের সব রাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা রাতের আহার সেরে নেয়।

এখন যদি রসগোল্লার টোপও ফেলিস তাহলে ওরা স্পর্শ করবে না। তাই শেষরাতে চার ফেলব। ঘুম থেকে উঠেই যাতে খেতে পায়। আমি ধরব আর তুই শুধু এক এক করে থলিতে পুরবি।

ভূতি বলল, তা নয় হলো এখন আমাদের কী করণীয় ?

সে বললে, চল, আপাতত সামনের অশবথগাছে উঠে নাক ডাকিয়ে ঘুমোই। ক্লান্তিতে ভূতির শরীর আর বইছিল না। ঘুমানোর কথা বলতেই আনন্দে তার ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে নাল গড়িয়ে পড়ল টপ টপ করে।

ভূতির তখনও নাক ডাকছে।

কিম ভূত নিঃশব্দে ছিপ আর ঘুঘুপাখীর ডিম নিয়ে গাছ থেকে নীচে নামল। এবং ডিমগুলো সে টপাটপ মুখে ফেলে দিল।

ছিপটা মাটিতে পুঁতে রেখে, সুতোটা ধরে ঝিলের জলে নেমে গেল।

জলে ডুব দিয়ে বঁড়শিবাঁধা সুতোটা যেন কি করল। তারপর লা-লা করে গান গাইতে গাইতে উঠে এল জল থেকে।

গায়ের জল না মুছেই ভূত উঠল গাছে।

ভূতির পাশে দেহটা এলিয়ে দিয়ে সেই যে চোখ বুজল, খুলল পরের দিন সকালে ভূতির চেঁচামেচিতে।

কিম ভূত বিরক্ত হয়ে বলল, সাতসকালে এত চেঁচামেচি করছিস কেন রে, কী হয়েছে তোর ?

ভূতি মুখ গোমড়া করে বললে, এত কষ্ট করে এখানে এসেছিস কি ঘুমোতে।

এখনও চার ফেলিসনি। মাছ ধরবি কখন ?

কিম ভূত চোখ বুজিয়েই মিটকে মিটকে হাসতে লাগল। ফিসফিস করে বললে, তোরজন্যে কি অপেক্ষা করেছি।

দেখ্‌গে যা, মাছগুলো টোপ গিলে কেমন পস্তাচ্ছে।

তার কথা শুনে ভূতি বেশ একটু অবাক হয়ে গিয়ে বললে, তার মানে ? তুই কি বলছিস কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

সে উঠে বসল। ভূতিকে বলল, মাঝরাতে উঠে ঘুঘুর ডিমে মন্ত্র পড়ে জলে ছেড়ে এসেছি।

যাতে ভোরবেলা উঠে জলখাবার ভেবে মাছেরা ডিমগুলো গিলে ফেলে।

এখন আর বিরক্ত করব না।

আস্তে আস্তে ডিমগুলো হজম হয়ে যখন পাকস্থলীর মধ্যে চলে যাবে, তখন ছিপের এক একটা হ্যাঁচকা টানে এক একটাকে পাড়ে টেনে তুলব।

কিম ভূতের মতলব শুনে ভূতি হেসে গড়াগড়ি খেতে খেতে বললে, বাবাঃ তোর কী বুদ্ধিরে কিম ভূত। তুই যদি মানুষ হতিস নির্ঘাত বেরিষ্টার হতিস।

সারাদিন ঘুমানোর পর সন্ধ্যাবেলা কিম ভূত ভূতিকে নিয়ে নামল গাছ থেকে।

ছিপটা হাতে নিয়ে সজোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়েই চীৎকার করে বললে, ভূতি শিগ্গীর আয়। গিঁ-থে-ছে!

কিম ভূতের গলা পেয়ে ভূতি পড়ি কি মরি করে দৌড়ে এসে বললে, কী গিঁথেছে রে দেখি?

সে ভূতির হাতে ছিপটা দিয়ে বললে, টেনে দেখ। বুঝতে পারবি।

তার কথামতো ভূতি সুতো ধরে টানল। সুতো নড়ে না।

ভূতি বলল, হ্যাঁরে কী ব্যাপার বলত?

কিম ভূত হাসতে হাসতে বললে, নিশ্চয়ই মাছের বাপ কিংবা ঠাকুর্দায় টোপ গিলেছে। তা নাহলে কখন এত ভারী হয়।

হুঁ হুঁ সবই বুদ্ধির খেলা বলে কিম ভূত বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

ভূতি বলল, কী করে তুলব?

সে বলল, টেনে তোলা যাবেনা। কম করে পাঁচ দশ মণ ওজন তো হবেই।

ছিপ ধরে সর্বশক্তি দিয়ে টান মার, শুড় শুড় করে বাছাধন জল থেকে উঠে আসবে।

ভূতি বুকভরে দম নিয়ে, ভূতের কথামত সত্যি সত্যিই ছিপ ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। টান মারার সঙ্গে সঙ্গেই সুতো ছিঁড়ে ভূতি ছিটকে পড়ল পিছনে একটা গর্তের মধ্যে।

ভূতির যখন জ্ঞান হল, সর্বাঙ্গে তার কেটে ছড়ে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

সে বলল, বাসায় যাব। মাছ ধরার সখ মিটে গিয়েছে।

কিম ভূত বলল, বলছিস যখন চ—ল্।

বীরত্ব

সকাল থেকেই আকাশ লাল থমথমে। যে কোনও মুহূর্তেই ঝড় উঠতে পারে।

কিম ভূত গাছ থেকে নামব নামব করছিল। ভূতি তাতে বাদ সাধল। বললে, আকাশের যা ভাবসাব বেশ জোরালো ঝড় উঠবে বলেই মনে হচ্ছে। আজ আর তোর বেরিয়ে কাজ নেই। শেষকালে অপঘাতে প্রাণটা দিবি।

উপদেশটা যে তার ভালো লাগল না সেটা তার মুখের চেহারা দেখেই বোঝা গেল।

রীতিমত খেঁকিয়েই বলে উঠল, আর কি আমি ছেলেমানুষ আছি যে তোর কথামতই আমাকে চলতে হবে। পাঁচখানা একশো পেরিয়ে এলাম, ভেবেচিন্তে কাজ করার মত যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। আর তোকে অত উপদেশ দিতে হবে না।

তোর যদি এতই ভয় করে তুই বরং দুধপুকুরে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকগে যা। আপনি বাঁচলে বাপের নাম—

তার সামান্য অনুরোধের উত্তরে সে যে এত কথা শোনাবে, একবারও সে ভাবতে পারেনি। ভালোর জন্যই বলতে গিয়েছিল সে। স্বভাবতই তার একটু অভিমান হল। মুখটা গোমড়া করে বললে, যা-না, বিপদে পড়লে তখন প্যানপ্যান করতে আসিস নি।

ইতিপূর্বেই কিম ভূতের একটু মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। এই কথা শোনার পর প্রায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সে। মুখ হাত—পা নেড়ে বললে, য্যা—য্যা বিপদে পড়লে না দেখলিতো ভারি বয়েই গেল।

হঠাৎ সে তার পাঁজরবেরকরা বুকে গোটা কয়েক চাপড় মেরে বললে, ঝড়ের হাত থেকে বাঁচবার মত শক্তি আমি রাখি। বহু ঝড় খেয়েছি ভুলে যাসনি যেন।

ভূতিকে আরও বেশী করে সাহস দেখানোর জন্যই সে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল। এবং বট তলার দিকে পা বাড়াল।

পাঁচ—পা ও এগোয় নি হঠাৎ সেই ঝড় উঠল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়ের প্রচণ্ড দাপট গ্রাস করল সেই ভূতাঞ্চলকে। ঝড়ের দাপটে হুড়—মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়তে লাগল বড় বড় গাছগুলো।

এবারে কিম ভূতের টনক নড়ল। এই মুহূর্তে বাসায় ফিরে যাওয়াই তার

উচিত ছিল। কিন্তু যেভাবে সে ভূতিকে তেজ দেখিয়ে এসেছে তারপক্ষে এখুনি আর ফিরে যাওয়া চলে না। অগত্যা জিদ ভরেই সে বড় বড় পা ফেলেই হাঁটতে লাগল।

পথে অবশ্য বার বারই বাধা পড়তে লাগল। একটা ডাব তার মাথার ওপর খসে পড়তে, মাথাটা ফুলে ঢোল হয়ে গেল।

এখন আর কিছুই করার নেই। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে আবার রওনা দিল। সুমুখেই গভীর বনপথ।

এদিকে ঝড়ের দাপট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। গাছগুলো আর মাটিতে পড়ার অবকাশ পাচ্ছে না। সোজাই উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে শূন্যে।

এতক্ষণ তার তেমন ভয় করেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে সশঙ্কিত হয়ে উঠল সে। হাতের নাগালে একটা তালগাছ দেখতে পেয়ে জাপটে ধরল সেটা। ভেবেছিল ঝড় তাকে বুঝি বা স্পর্শ করতে পারবে না।

কিন্তু কিম ভূতের ফন্দিটা টিকল না। ঝড়ের ধাক্কায় থর-থর করে কাঁপতে শুরু করল সেই তালগাছটা। পরমুহূর্তেই হঠাৎ একটা ঝড়ের ধাক্কা খেয়ে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠতে শুরু করল গাছটা।

প্রায় রকেটের গতিবেগেই সে উঠতে আরম্ভ করল ওপরে।

এবারে সে প্রমাদ গুনল। যদি তার হাত দুখানা কোনওক্রমে শিথিল হয়ে যায়, মাটিতে পড়লে একেবারে গুঁড়ো হয়ে যায়।

হয়তবা তাকে দেখে আর কেউ চিনতে পারবে না।

অগত্যা সে তার দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল তার দুই বজ্র মুষ্ঠিতে। কোনওক্রমেই যাতে ভূপাতিত না হয়।

যতই উঁচুতে উঠছে সবকিছুই ছোট হয়ে যাচ্ছে। যে গাছে তাদের বাসা ছিল, সেই গাছটা আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। অন্যান্য গাছপালার সাথে মিশে গিয়েছে। সেটাও অবশ্য তার আর একটি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

সে যদি আর না ফিরে ভূতির কি হাল হবে? কেইবা তাকে দেখবে, কেইবা তাকে খাওয়াবে পরাবে?

পিছন ফিরে তাকাতে হিমালয় পর্বতটা তার চোখে পড়ল। সেটা একটা মাটির তালের মতই দেখাচ্ছে।

উড়তে উড়তে সে সাত সমুদ্দুর সাতশো নদী পেরিয়ে আকাশ ছোঁওয়া এক প্রাসাদের চিলছাদে নেমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

জ্ঞান ফিরল যখন আকাশে দুর্যোগের নামগন্ধ নেই। চকচকে নীল আকাশ জুড়ে পূর্ণিমার চাঁদ। তারই শুভ্র জ্যোৎস্নায় আলোর বন্যা বইছে চতুর্দিকে।

সে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। হঠাৎ পাঁচিলের ওপাশ থেকে একটা অল্প বয়সি সুন্দরী পেতনি পা—পা করে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

কিম ভূতের মনে অনেকরকম দুরাশংকাই হচ্ছিল। এই মুহূর্তে পেতনির মুখ দর্শনে সে খুশীই হল।

পেতনিটাও পা—পা করে এগিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে।

সে তার মুখটা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, তোমায় খুব চেনা মনে হচ্ছে। তোমায় কোথায় দেখেছি বলতো।

পেতনিটার চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল। সেও তাকে চিনতে পেরেছে। প্রায় তার কানের কাছেই মুখটা নিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললে, এখান থেকে সাতশো পুকুর পেরিয়ে জাম তলায় আমাদের বাসা। সেখানে আমার আত্মীয় স্বজনেরা সকলে আছে।

—তাই বুঝি। তা তুমি এখানে এলে কি করে?

তার প্রশ্ন শুনে সে পিঁউ পিঁউ করে কেঁদে উঠে বললে, এক মামদো ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে আমায় এখানে। সামনে যত আস্তানা দেখছ এককালে সবই মানুষের ছিল।

কিন্তু মামদোরা ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে সকলকেই তাড়িয়েছে এখান থেকে। এখন সবটাই তাদের দখলে।

কিছুদিন হল এদের দুপায়ে গোদ রোগ দেখা দিয়েছে। গোদা পা নিয়ে তারা ভালো করে নড়াচড়া করতে পাচ্ছে না।

টোটকা টুটকি করছে বটে কিন্তু কোনই কাজ হচ্ছে না। বরং রোগ দিন দিন বেড়েই চলেছে। শেষ পর্যন্ত তারা বাবা কুটকুটেশ্বরের কাছে ধর্ণা দেয়।

বাবা কুটকুটেশ্বর নাকি স্বপন দিয়েছে, কাঁচ পেতনির মাথা হেঁচে গোদের ওপর তার প্রলেপ দিলে তবেই নাকি এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

সেই কারণেই ওরা আমাকে ধরে এনে এখানে বন্দী করে রেখেছে। যে কোনও মুহূর্তেই আমার মাথা ছেঁচতে পারে।

পেতনির কথা শুনে কিম ভূত আঁৎকে উঠে বলল, সেকি কথা! পালাস নি কেন এখান থেকে?

সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, পালাবার কি উপায় রেখেছে। একদল মামদো দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে আমাকে। অমাবস্যা তিথিতে বাবা কুটকুটে-শ্বরের পুজো। সেইদিনই বোধহয়—

কিম ভূত খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। উঠে বসে গালে হাত দিয়ে তাকে বাঁচাবার উপায় ভাবতে লাগল।

পেতনিটা অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্থান ত্যাগ করল। যাবার সময় বলে

গেল, আমাকে কিছুক্ষণ না দেখতে পেলেই ওরা খুঁজতে বেরোয়।

আমি এখন যাচ্ছি। সময়মত আবার আসব। তুমি সাবধানে থেকো। ওরা দেখতে পেলে কিন্তু তোমায় রক্ষে রাখবে না।

দেখতে দেখতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

হঠাৎ সেই পেত্নীটার পুনরাবির্ভাব ঘটল। বললে, তোমার জন্য কিছু খাবার এনেছি। খেয়ে নাও।

ক্ষিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছিল তার। পেত্নির মুখ থেকে সে কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই খুশীতে ঝলমল করে উঠল তার মুখটা।

তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে পাত্রটা টেনে নিয়ে সে গব গব করে বনবিড়ালের মাংস খেতে শুরু করল। ক্ষিদের মুখে মুহূর্তের মধ্যেই নিঃশেষ করে দিল সে পাত্রটা। হাত চাটতে চাটতে বললে, যাক্ বাঁচালি। বড্ড খিদে পেয়েছিল!

এখন তোকে আমায় বাঁচাতেই হবে। এখান থেকে পালাবার কি কি পথ আছে শুনি।

সে বললে, সব পথই বন্ধ। গাছ বেয়ে নামার যতগুলো পথ ছিল সবই ওরা আগলে রেখেছে। একমাত্র লাফ মেরে পড়া ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু লাফ মারা তো সোজা ব্যাপার নয়। খুবই কঠিন কাজ। তাছাড়া ওপর থেকে লাফ মারলে নীচে পড়ার শব্দ হবেই। ওদের টনক নড়ে যাবে!

ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই! আমাদের দুজনের মাথাই ছেঁচবে। অন্য কোনও উপায় বার করতে হবে।

এবার কিম ভূতের মুখে এক দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। তাহলে উপায়—

পেত্নীটা হঠাৎ কি একটা শব্দ শুনে দৌড়ে চলে গেল সেখান থেকে। এবং তর্ তর্ করে নেমে গেল নীচেতে।

কিম ভূত একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এমন কী ঘটল!

পেত্নীটা ঘুরে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। বললে, এইমাত্র একটা গোপন খবর জেনে ফেলেছি। মামদোরা নাকি ধুতরোর বিচি সহ্য করতে পারে না।

বড় মামদোর কাছে একটা ধুতরো ফল আছে। ফলটা সর্বদাই সে আগলে রাখে। পাছে কেউ খেয়ে অঘটন ঘটায়।

কিম ভূত শুনে ভ্রু কোঁচকাল। এখবর তার অজানা নয়। কিন্তু এই সাত সমুদ্দুর সাতশো নদী পারে ধুতরো ফল পৌঁছল কি করে!

সে বললে, তাও জেনেছি। বড় মামদোকে জব্দ করার জন্যই তারা অনেক পরিশ্রম করে এটা আনিয়েছিল সেখানে। কিন্তু এমনই ভাগ্য, একটা পাখীতে সেটা চুরি করে নিয়ে যেতে যেতে বড় মামদোর মাথার ওপরেই ফেলে দেয়।

দেখেশুনে বড় মামদো রীতিমত ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এবং তখন থেকেই ট্যাঁকে পুরে রেখে দিয়েছে সেটা। কিছুতেই হাত ছাড়া করে না।

কখন কে তার সাথে শত্রুতা করবে কে জানে।

চক চক করে উঠল কিম ভূতের চোখ দুটো। ট্যাঁকে রাখে ঠিক শুনেছিস তো?

সে ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ শুধু শুনিইনি। স্বচক্ষে দেখেছিও।

কিম ভূত মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, এই ধুতরো ফলটাকেই কাজে লাগাতে হবে। আজ ভাবি কাল বলব তোর কি করনীয়—

পরের দিন যথাসময়েই কিম ভূতের সঙ্গে দেখা হল তার। সে তাকে কাছে বসিয়ে মাথায় হাত রেখে বললে, যা বলি মন দিয়ে শোন।

বড় মামাদো যখন একা ঘরে শুয়ে থাকবে, তুই তার গোদা পায়ে হাত বুলিয়ে দেবার প্রস্তাব করবি। বলবি বাবা, আমার তো সময় ফুরিয়ে আসছে। যাবার আগে একটু আপনার পদসেবা করে যেতে চাই।

আপনার পা স্পর্শ করলে আমার আর জীবনে আফশোষ থাকবে না। শেষ ইচ্ছা পূরণ হবে।

ধুতরো ফলটা এইভাবেই হাতিয়ে নিতে হবে বড় মামদোর কাছ থেকে। তারপর সকলকে······

সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাড় নেড়ে বলল, পারব। এ আর এমন কি কঠিন কাজ।

বড় মামদো চোখ বুজিয়ে কাঁচা সুপুরি চুষছিল। হঠাৎ পেতনির আবির্ভাব ঘটল সেখানে।

বড় মামদো পিট পিট করে তাকাল তার দিকে। কী চাই তোর এখানে?

—কিছু না। এমনকি প্রাণ ভিক্ষাও না!

—বটে। তাহলে!

আমি বিদায় মুহূর্তে ওই গোদা পা দুখানায় একটু সেবা করতে চাই।

—সেবা করবি? এতো আনন্দের কথা। যেচে সেবা করার দিন তো অনেককাল আগেই চলে গিয়েছে।

বেশ এই পা বাড়িয়ে দিলাম। একটু মন দিয়ে করিস বাপু।

সে মুচকি হেসে বলল, সে কথা আর বলতে—

বড় মামদো পা টান টান করে শুয়ে রইল। আর সে তার পদসেবা করতে লাগল।

গোদ হতে মামদোর পায়ে অস্বস্তির শেষ ছিল না। চকচক করছিল পায়ের কুচকুচে কালো চামড়াটা, ফাটলও ধরেছিল কোথাও কোথাও।

তারওপরেই হুল ফুটিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে ড্যাঁশ মশাগুলো।

সে যখন মশা তাড়িয়ে পায়ে হাত বুলোতে লাগল আরামে তার চোখ

দুটো বুজে আসতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরামে নাক ডাকতে শুরু করল মামদোর।

সে এই মুহূর্তের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বড় মামদোর নাক ডেকে ওঠার পরেই সে তার ট্যাঁক স্পর্শ করল।

বড় মামদো কিছুই টের পেল না।

এবারেই সে তার সরু সরু আঙুলগুলো চালিয়ে দিল সেই শুকনো ধুতরোর সন্ধানে। তার আশা পূরণ হল। বেরিয়ে এল সেটা তার ঘুপসির ভিতর থেকে।

এদিকে কিম ভূত পা টিপে টিপে নেমে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সে ধুতরোটা টেনে বার করার সাথে সাথে তার হাত থেকে সেটা নিয়ে বললে, কাজের কাজ করলি। কিন্তু এখনও বিপদ কাটেনি।

তুই পদসেবা চালিয়ে যা। যেন কিছুতেই ঘুম না ভাঙ্গে। এদিকে যা কিছু করার আমিই করছি।

কিম ভূতের নির্দেশ মতোই সে আবার পদসেবা শুরু করল।

এদিকে কিম ভূত ধুতরো ফলটার খোসা ছাড়াতে অসংখ্য বীচি ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। সযত্নে সে বীচিগুলো তুলে নিল মাটি থেকে।

বীচিগুলো বেশ তাজাই রয়েছে। সেগুলো নিয়ে সে পা টিপে টিপে নামল।

বাইরে যাবার পথগুলো সবই আগলে রেখেছে বড় মামদোর চেলা চামুণ্ডেরা। তবে সকলেই ক্লান্ত। সকলেই অল্পবিস্তর ঝিমোচ্ছে ঈষৎ হাঁ করে।

কিম ভূত এমন অবস্থাই চাইছিল। কাল বিলম্ব না করেই সে লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে এক একটা ধুতরো বীচি ফেলে দিতে লাগল সকলের মুখে মুখে।

এমন নিঃশব্দে সে কাজটা সারল, মামদোর চেলা চামুণ্ডেরা কিছুই টের পেল না। অথচ সকলেই জ্ঞান হারাল।

ইতিমধ্যেই আর এক কাণ্ড ঘটল। হঠাৎই বড় মামদোর ঘুম ভেঙে গেল। ইতিমধ্যেই তার খাওয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বভাবতই ক্ষুধার ঝোঁকে সে 'গুল' 'গুল' বলে চীৎকার জুড়ে দিল। তাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব গুগুলেরই।

কোথায় গুগুল। কিম ভূত তো ইতিমধ্যেই তার কাজ সেরে রেখেছে!

মামদো তার কোনও সাড়া না পেয়ে বেরিয়ে পড়ল তার আস্তানা থেকে। কিন্তু যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল সে প্রথম দৃষ্টিপাতে তা বিশ্বাস করতেই পারল না।

ক্রমশ তার ধুতরো ফলের কথা মনে পড়ল। ট্যাঁকে হাত দিয়ে সে তা

খুঁজে না পেয়ে, মোটামুটি আঁচ করে নিল ব্যাপারটা।

তখুনি সে তেড়ে গেল পেতনিকে। ভূত আগেই আঁচ করেছিল এমন ঘটনা ঘটতে পারে। সে আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল সুযোগের জন্য।

মামদো তাকে ধরে মাথাটা চিবানোর জন্য মুখে পোরার মুহূর্তেই সে তার শেষ সম্বল ধুতরোর বিচিটা ছুঁড়ে দিল তার মুখের মধ্যে।

সেটা সরাসরি পেটে পৌঁছানো মাত্রই মাথায় হাত দিয়ে মামদো বসে পড়ল সেখানে। এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

মামদোপুরির কোলাহল চিরতরে স্তব্ধ হল।

কিম ভূত বলল চল, এইবেলা সরে পড়ি। এদের আবার কখন জ্ঞান ফিরে আসে তার ঠিক নেই।

এদিকে দুই বাসাতেই তখন কান্নাকাটি সবে শুরু হয়েছে।

দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে কিম ভূত যখন পেতনিটাকে তার বাসায় পৌঁছে দিল, খুশীর বন্যা বহে গেল সেখানে।

এদিকে কিম ভূত ফিরে আসতে ভূতি খুশীই হল।

তার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে বলল, তুই যে এতবড় বীর তোর চেহারা দেখলে কিন্তু টের পাওয়ার যো নেই।

গান

কিম ভূত অকারণে বড় একটা হাসে না।

সেদিন হঠাৎ অকারণ হাসি-হাসি মুখে বাসায় ফিরে বললে, ভূতি কোথায় গেলিরে। তাড়াতাড়ি শুনে যা এদিকে। একটা দারুণ মজার খবর আছে।

কদিন ধরে অরুচি হওয়ার জন্য ভূতি মগডালে পা ঝুলিয়ে বসে বসে নিমডাল চুষছিল। হঠাৎ কিম ভূতের খুশীতে ভরা গলা পেয়ে তর্ তর্ করে নীচে নেমে এসে বললে, ডাকছিস কেন রে? কী খবর এনেছিস?

কিম ভূত তার ঝোলা থেকে দুটো লম্বা লম্বা ঠ্যাং বার করে বললে, বলতে পারিস ঠ্যাং দুটো কার?

ভূতি নিমডাল চুষতে চুষতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে। বললে, নামটা মনে পড়ছে না। তবে খুবই চেনা ঠেকছে!

তার মন্তব্যে কিন্তু কিম ভূত খুশী হল না। বললে, এখন চোখে নাও পড়তে পারে। এক সময় তো পথে ঘাটে অনবরতই দেখতিস। দ্যাখ্ দেখি মনে পড়ে কী না।

অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে ভাবল সে। পেটে আসছে কিন্তু মুখে আসছে না নামটা।

হাতে ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ নাকের কাছে আনতেই তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। বললে, এতক্ষণে মনে পড়েছে। টাট্টু ঘো—ড়া!

ঠিক। কিম ভূত মুচকি হাসল। অনেকদিন খাওয়া হয়নি। প্রায় ভুলেই গেছলাম। যাহোক চচ্চড়ি বানা। খেয়ে একটু মুখ ছাড়াই।

শুনে ভূতিও খুশী হল। সঙ্গে সঙ্গেই সে দৌড়ল টাট্টুর ঠ্যাঙ দিয়ে চচ্চড়ি বানাতে।

কতক্ষণই বা লাগে। চচ্চড়ি রাঁধা শেষ করে ভূতি এসে বসল তার মুখের সামনে।

সে বসে পা নাচাচ্ছিল। ভূতি এসে তার সামনে বসতে সে সরব হল। বললে, আজ পথে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মনে হল অনেকদিন মানুষের ঘাড়ে চাপা হয়নি। মাঝে মাঝে একটু না চাপলে অভ্যাসটাই চলে যাবে। আজ বরং কারুর ঘাড়ে চাপা যাক্।

কার ঘাড়ে চাপা যায় ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, হঠাৎ চোখ পড়ল গঙ্গায়। একজন ওস্তাদ গাইয়ে গলা পর্যন্ত জলে ডুবে গান সাধছে এবং গলা থেকে নানারকম গিটকিরি সৃষ্টি করছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তার গান শুনলাম। রেওয়াজী গলা বেশ লাগছে।

হঠাৎ মনে হল এই ওস্তাদেরই ঘাড়ে চড়লে কেমন হয়। গান শোনাও হবে, ঘাড়ে চড়াও হবে। 'জয় মা' বলে চেপে বসলাম তার ঘাড়ে। ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা কপালে চোখ তুলে গোঁ—গোঁ শব্দ করতে লাগল।

আশে পাশে যারা স্নান করছিল তারা প্রথম প্রথম তেমন নজর দেয়নি। ভেবেছিল এটাও বোধহয় তার গানের রেওয়াজেরই অঙ্গ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সে ভুল ধারণা দূর হল।

ওস্তাদকে কাঁপতে কাঁপতে জলের মধ্যে পড়ে যেতে দেখে তারা এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলল। কেউ বললে, হিড়িম্বা রাগে গান ধরেছে ওস্তাদ। ওই রাগে নাকি স্বরের পর্দা ওইরকমই কাঁপে।

আর একজন বললে, ধ্যুৎ হিড়িম্বা নয়। গঙ্গৌ রাগ। গঙ্গৌ রাগে পর্দা কাঁপতে কাঁপতে চড়ে আবার কাঁপতে কাঁপতে নামে।

ওদের মধ্যে যখন বাদবিতণ্ডা জমে উঠেছে একজন স্নানার্থী এগিয়ে এসে বললে, কোনও রাগই নয়। ওকে এখন ভূত রাগে ধরেছে। বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

তার কথা মেনে নিয়েই শেষপর্যন্ত ওস্তাদকে বাড়ী নিয়ে আসা হল। আমি অবশ্য তাকে রেহাই দিলাম না।

ডাক্তার বদ্যির ঝামেলা বিশেষ পোহাতে হল না তাকে। ওস্তাদের এক কাকা ওঝা ছিল। দেখামাত্রই বলে উঠল, উঁহু এত ভাল ঠেকছে না। হাওয়া লেগেছে মনে হচ্ছে।

ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গেই হাওয়া ছাড়ানোর চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। নানা পূজানুষ্ঠান শুরু হল ওই ওস্তাদকে ঘিরে।

এদিকে ধোঁয়ার চোটে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

ওঝা ব্যাটা আমার মুখের সুমুখে ঝাঁটা নাচাতে নাচাতে বললে, কিরে এতলোক ছেড়ে এই ওস্তাদের ঘাড়ে চাপলি কেন? তোর মতলবটা কী শুনি।

তবে যদি গানটান শেখার ধান্দা থাকে স্পষ্ট করে বল। ওস্তাদকে বলে নয় ব্যবস্থা করে দেব। এভাবে ঘাড়ে চেপে তোকে থাকতে দেব না। কিছুতেই।

মনে রাখিস আমার নাম কাল্লু সিং। ভূত ফুত আমি ট্যাঁকে গুঁজে রাখি—

কাল্লু সিং-এর এই মন্তব্য শুনে মাথাটা প্রথম খুবই গরম হয়ে উঠেছিল। ট্যাঁকে রাখাচ্ছি। কিন্তু পরেই মনে হল অহেতুক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে লাভ কি।

তারচেয়ে গান শিখে নেওয়াই ভাল। ভূতেদের মধ্যে গান শেখার রেওয়াজ

নেই। অনেকেই মুখে বলে বটে কিন্তু আজও পত্তন হয়নি।

আমি যদি শিখে নিই, আমি দশজনকে শেখাতে পারব। এই দশজন যদি প্রত্যেকে দশজন করে শেখাতে পারে অচিরেই একশো হয়ে যাবো। আবার সেই একশ জন যদি প্রত্যেকে দশজন করে শেখায় একহাজার ভূত পেতনি সঙ্গীতবিশারদ হয়ে উঠবে।

আবার একহাজার ভূত যদি···ভাবতে ভাবতে আমি পুলকিত হয়ে উঠি—

ওঝার উদ্দেশে বলি, রাজী। কিন্তু আমাকে গান শেখাতে হবে।

গান শেখালে তবেই আমি প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখতে পারি।

ওঝা বললে, বেশ। আমি ওস্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এখনি তোকে জানাচ্ছি।

একটু ঢিলে দিতেই ওস্তাদ বেশ স্বচ্ছল হয়ে উঠল। ওঝা তখন ওর সঙ্গে এ বিষয়ে শলা পরামর্শ শুরু করল।

ভূতের চাপে ওস্তাদ অস্থির হয়ে উঠেছিল। গান শেখালেই পরিত্রাণ মিলবে। শোনামাত্রই সে রাজী হয়ে গেল। ওঝাও সে কথা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল আমাকে।

শুনে খুশীই হলাম। এত সহজে যে সুযোগ মিলবে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রশ্ন করলাম তা নয় হল, কিন্তু গানটা শোনাতে হবে কোথায় এবং কিভাবে সেটাও জানা দরকার।

ওস্তাদের সঙ্গে কথা কয়ে ওঝা জানাল, মাসে দুদিন দুঘণ্টা ওস্তাদ তোমার পিছনে খরচ করতে রাজী। প্রতি অমাবস্যারাতে বেলতলায় তুমি হাজির থেকে। ওস্তাদ ওখানেই তোমাকে তালিম দেবে।

এখন বুঝতে পাচ্ছিস আমার ভবিষ্যৎ কি বলে সে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

ভূতি এতক্ষণ পান্তুয়ার মতো গোল গোল চোখ করে কিম ভূতের কথা গিলছিল। কট্-কট্ করে দাঁত দিয়ে কটা নোখ কেটে বললে, আমিও ওস্তাদের কাছে গান শিখব। তুই যদি শিখতে পারিস আমিই বা পারব না কেন।

ভূতির কথা শুনে তো তার চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। গোল গোল চোখ করে বললে, তুই গান শিখবি কিরে? অনেক সাধনা দরকার। আমিই পারব কিনা তার ঠিক নেই তুই তো

কিম ভূত এতখানি তাকে নিরুৎসাহ করবে সে ভাবতেই পারেনি। বেশ হতাশ হয়ে গিয়েই বললে, বলছিস, তাহলে—তুইই শেখ। আমি নয় পরেই শিখে নেব।

সেদিন ছিল শনিবার। ঘুম থেকে উঠে পর্যন্ত সে খুব ব্যস্ত।

গলাটা ছুলে নিল সে একটা মোটা নিমকাঠি দিয়ে। ওস্তাদের কাছে গান শেখা তো খুব একটা সোজা কথা নয়। যদি সে ওস্তাদের মন জয় করতে না পারে গান শেখাটাই তার মাটি হয়ে যাবে।

গলা ছুলে কিম ভূত পেস্তাবাদামের সরবৎ নিয়ে বসল। নামী দামী গায়কেরা সকলেই নাকি, গলা সতেজ রাখার জন্য বাদামের সরবৎ খায়।

প্রায় এক জালা সরবৎ বানিয়ে ছিল ভূতি। নাইবা গান শিখুক সরবৎ চাখতে আপত্তি কি। কিন্তু কিম ভূতের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। অনবরত মুখে নানারকম শব্দ সৃষ্টি করে তার কন্ঠস্বর পরীক্ষা করছিল। কিন্তু খুশী হতে পারছিল না সে। দ্রুত ফল লাভের জন্য জালাশুদ্ধ সরবৎ সে ঢেলে দিল পেটেতে। তার ফল ভালো হয়নি। ভুটভাট শব্দ শুরু হয়ে গিয়েছিল পেটের মধ্যে।

সারাদিন ধরে সে অনেক সাধ্যি-সাধনা করল। একতাল মাটি নিয়ে সে গলার চারপাশে প্রলেপ দিল। পাছে গলায় ঠাণ্ডা লেগে তার গলা ভেঙে যায়।

সূর্যের আলো নিস্তেজ হতে, সে পা পা করে এগুল গঙ্গার ঘাটের দিকে।

ওদিকে ভূতের ভয়ে ওস্তাদ যথাসময়েই বেলতলায় হাজির হয়েছিল। বেলগাছটা অকারণ ঝপ-ঝপ শব্দ করে নড়ে উঠতেই ওস্তাদ বুঝল ছাত্র এসে হাজির হয়েছে।

ওস্তাদ বেলগাছে হেলান দিয়ে বসল। দু একটি প্রশ্ন করে জেনে নিল ছাত্র তৈরী কিনা। তারপর যথারীতি সঙ্গীত শিক্ষায় তালিম দেওয়া শুরু করল।

প্রথম দিন। দশমিনিটের মধ্যেই শিক্ষা শেষ। কিম ভূতের আনন্দ আর ধরে না। অনেকদিনের আশা এত সহজে সত্য হবে, এ যে স্বপ্নাতীত।

সঙ্গীত শিক্ষা শেষ হতে কিম ভূত খুশীতে দেহটা এলিয়ে দিল গাছের মগডালে।

জ্যোৎস্না রাত। ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়া তার ওপর গান গাওয়ার আনন্দ।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে এল। কিম ভূতের গানের তালিম চলেছে পুরোদমেই। তবে গুরুর নিষেধ থাকার জন্য সে এখনও কাউকে গান শোনায়নি।

গান গাইবার জন্য কেউ তাকে অনুরোধ জানালে বলে, সবুর কর শোনাব। জানোই তো সবুরে মেওয়া ফলে। সবাইকে এড়িয়ে গেলেও মুস্কিল হল ভূতির আসন্ন জন্মদিনে। ভূতি বলল, আমার জন্মদিনে তোকে গান গাইতেই হবে।

তার সেই প্রতিজ্ঞা আর রাখা গেল না। সকলকে সে চটাতে পারে কিন্তু ভূতিকে সে চটাবে কোন সাহসে।

সে গানের আসরের জন্য তৈরী হতে শুরু করল।

ভূতের রাজ্যে এই প্রথম গানের আসরের খবর রটে গেল সারা বনাঞ্চলে। সকলেই উদগ্রীব হয়ে উঠল এই গান শোনার জন্য। ভূতের গলা থেকে গান বেরোবে এ যে পৃথিবীর দশম আশ্চর্যেরই সামিল।

এদিকে জন্মদিনেরও আর দেরী নেই। কাল বাদে পরশুই এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে গণ্যমান্য সকল ভূত পেতনিকে।

যারা নিমন্ত্রণ পায়নি তারা নানাভাবেই ধরাধরি শুরু করেছে অনুষ্ঠান শোনবার জন্য।

এবছর একটু বেশী করেই সাজছে ভূতি। কপালে সাদা চুনের টিপ পরেছে। চোখের ভ্রূ এঁকেছে। গেরুয়া মাটি ঠোঁটে বুলিয়েছে।

গলায় লাল জবা ফুলের মালা দুলিয়েছে। কাছেই একটা শ্মশান থেকে পরিত্যক্ত একটা চেলি এনে জড়িয়েছে কোমরে।

যাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাদের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করেছে কিছু। বেশ কিছু ছুঁচো ধরে লেজ আর পা বাদ দিয়ে মশলা মাখিয়ে রেখেছে সে।

এই নতুন খাবারটা তারই আবিষ্কার। ছুঁচো ও জলখাবার হিসেবে চলতে পারে সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না ভূতেদের।

ভূতি ঘটনাক্রমে একদিন একটা ছুঁচোর দেহে হঠাৎ কামড় বসিয়েই এই গোপন তথ্যটা আবিষ্কার করে ফেলেছে। তার জন্মদিনেই সে সেটা সাধারণের হাতে তুলে দিয়ে বাজিমাৎ করবে।

কিম ভূতও পিছিয়ে নেই। ভূতের রাজ্যে প্রথম সঙ্গীতানুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাদ্যযন্ত্র হিসাবে সে সংগ্রহ করেছে একটা ফুটো মাটির হাঁড়ি। একজন প্রতিবেশী টোকা দেবে বলে স্থির করেছে।

নির্দিষ্ট দিনে একে একে নিমন্ত্রিত ভূত পেতনিরা আসতে শুরু করেছে। কাশ ফুলে ভরা এক উদ্যানে বসেছে অতিথিরা সারিবদ্ধ হয়ে।

শুরুতেই ছুঁচোর মাংস পরিবেশন করা হল অতিথিদের। সকলেই অল্পাবিস্তর মুখ কোঁচকাল। সাহস করে কয়েকজন আস্বাদন করা মাত্রই রীতিমত হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত কাড়াকাড়ি পড়ে গেল তাদের মধ্যে।

যারা বলিষ্ঠ ছিল তারা দুর্বলদের হাত থেকে কেড়ে কেড়ে খেতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ এই বিশৃঙ্খল অবস্থা চলল। ভূতি বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়েই
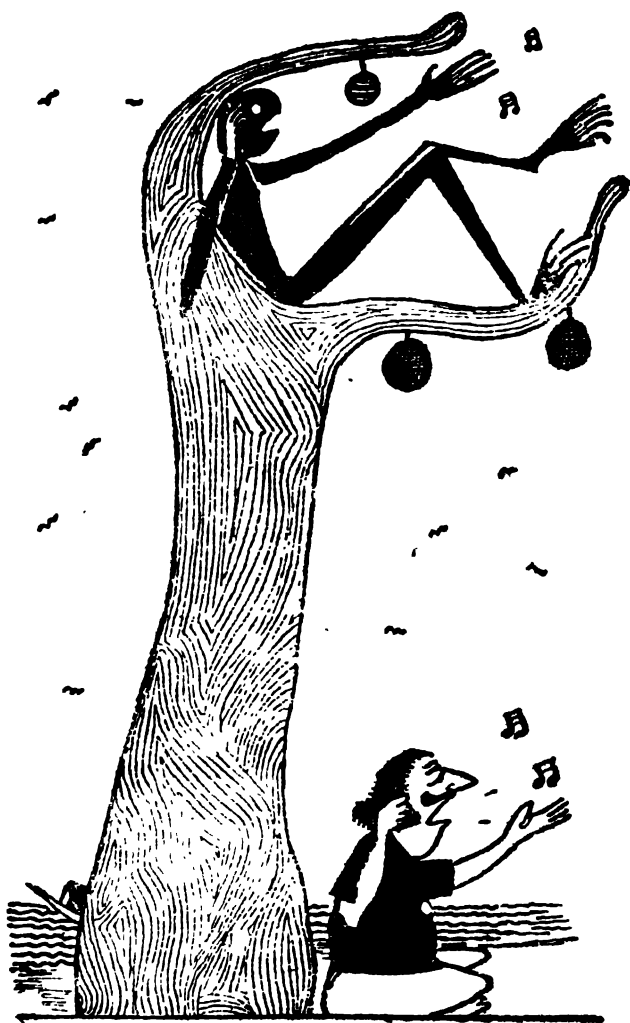
অনেকদিনের স্বপ্ন এত সহজে সত্য হবে, এ যে স্বপ্নাতীত!

বলল, অবস্থা তো সুবিধের মনে হচ্ছে না। কী হবে রে?

কিম ভূত মুখ ফুটে কিছু বলল না,। মুখে একটা আঙ্গুল ঠেকিয়ে বলল, চুপ করে থাক। স্বভাব কি কেউ ভুলতে পারে। এখুনি মীমাংসা হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাইই হল। খানিকটা সময় ধস্তাধস্তি চলার পর আবার নিজ নিজ আসনে সকলে স্থির হয়ে বসল।

কিম ভূত বলল, তাহলে এবার শুরু করি। কী বলিস—

ভূতি ঘাড় নাড়ল।

দুই হাঁটুর ফাঁকে ফুটো হাঁড়িটাকে চেপে ধরল সেই প্রতিবেশী। তার ওপর একটা ইঁটের টোকা দিয়ে সুর সৃষ্টি করল। তার এই কাণ্ড কারখানা অবাক হয়ে দেখতে লাগল রাজ্যের ভূত পেত্নি শ্রোতারা।

সপ্তম পর্দায় গান শুরু করল কিম ভূত। যদিও এ সম্পর্কে তার কোনও ধ্যানধারণাই নেই।

ফল হল তার ভয়ঙ্কর। হঠাৎ চারদিক থেকে পট—পট—পটাং ইত্যাদি বিচিত্র সব শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

কেউই আঁচ করতে পারেনি ব্যাপারটা কি ঘটতে চলেছে। শব্দটা কিসের হতে পারে এই নিয়ে কেউ কেউ কৌতূহল প্রকাশ করল বটে কিন্তু শব্দের উৎসটা ধরতে পারল না।

হঠাৎ ভূতি অনুভব করল তারই এক বান্ধবীর দুই কানের ভিতরে পট পটাং শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চোখ রাখল তার কানের ছিদ্রে।

ইস্ দুই কানের পর্দাই তার ফেটে চৌচির। সে ইচ্ছে করেই সে কথা প্রকাশ করলে না। এ নিয়ে এখুনি হৈ চৈ বাধুক সে চায় না।

যদিও চারদিক থেকেই মুহুর্মুহু সেই ভয়ঙ্কর শব্দ ভেসে আসতে লাগল তার কানেতে।

এদিকে কিম ভূত চোখবুজিয়ে পরমোৎসাহে গান গেয়ে চলেছে।

হঠাৎ আর এক অশান্তি উদয় হল। হঠাৎ চতুর্দিক থেকে একটা হৈ-চৈ শব্দ ভেসে আসতে শুরু করল।

ভূতির কেমন যেন ভালো লাগল না। সাধারণত ভূতের রাজ্যে যখন গোলমাল বাঁধে তখনই এই ধরনের চীৎকার ভেসে আসে।

সে কিম ভূতের উরুতে একটা চিমটি কেটে সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। কোনই লাভ হল না। কিমভূত তখন দরাজ কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছে।

এদিকে গণ্ডগোল উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ক্রমশ 'মার' 'মার' শব্দটা স্পষ্টতর হয়ে উঠল। ভূতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলতে চোখে পড়ল হাজার হাজার

ভূত পেতনি দুহাতে দুকান চেপে ধরে 'মার' 'মার' বলতে বলতে সেই দিকেই তেড়ে আসছে।

কারণটা নির্ণয় করতে ভূতির কোনই অসুবিধা হল না। সে এবার কিম ভূতের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, ওরে ভূত সমূহ বিপদ। দোহাই তোকে আর গান গাইতে হবে না। বন্ধ কর—

ভূতি পায়ে ধরতে সে একটু অবাকই হল। গান থামিয়ে বলল, ব্যাপারটা কি শুনি ?

সে বললে, একবার সুমুখে তাকা তাহলেই বুঝতে পারবি। ইতিমধ্যে তারা অনেক এগিয়ে এসেছে। চীৎকার করে বলছে, 'নির্ঘাত ব্যাটার ঘাড়ে মানুষ চেপেছে। তা না হলে কখনও ভূতজাতিকে কানের পর্দা ফাটিয়ে কালা করে দেবার ফন্দি আঁটে।'

দুঘা দিলেই বাছাধন সোজা হয়ে যাবে।

এদিকে শ্রোতা হিসেবে যারা উপস্থিত ছিল তারা যখন বুঝতে পারল 'পটাং' শব্দের বিপদটা তখন তারাও উত্তেজিত হয়ে উঠল।

কিম ভূত দেখল বেগতিক। এই কয়েকহাজার ভূত যদি তাকে দুঘা করে দেয়, নির্ঘাত যমের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে।

হাঁড়ি মাড়ি ফেলে সে ভূতির হাতধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করল।

গুল

রক্ষাকালীর পুজো ছিল সেদিন।

মায়ের পুজো থাকলে ভূতেরা সাধারণত একটু খুশীর মেজাজেই থাকে। কিম ভূতও ছিল সেদিন। ভূতিকে ডেকে বললে, আমি একটু বেরোচ্ছি। আমার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। তুই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়িস।

ভূতি গাছের ডালে বসে পা দোলাচ্ছিল। তার দিকে না ফিরে বললে, কেনরে? কোথাও যাচ্ছিস নাকি?

সে গম্ভীর হয়ে বললে, কোথায় আর যাব। আজ আমাদের আড্ডায় দুজন অতিথি আসবে। তাদের একটু উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে হবে এই আর কি।

সেইজন্যই দেরী হতে পারে। আর হতে পারেই বা বলি কেন ধরেনে হবেই—

এবারে কিন্তু ভূতি বেশ একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। মুখটা ওর কান পর্যন্ত বাড়িয়ে বললে, কোত্থেকে তারা আসছে?

সে একটু মুচকি হাসল। জায়গার নাম শুনে কি করবি। তুই কি সব দেশ চিনিস! ভূতি এবারে একটু বিরক্তই হল। চিনি আর না চিনি নামে শুনতে আপত্তি কি।

সে দেখল ভূতিকে অযথা চটিয়ে লাভ নেই। এবেলা না হোক ওবেলা না খেয়েই শুতে হতে পারে। একগাল হেসে বললে, এক মাদ্রাজী ভূত এসেছে দার্জিলিং থেকে। আর একটা ভুটিয়া ভূত এসেছে চেরাপুঞ্জী থেকে।

ভূতি ভ্রূ কুঁচকে বললে, ওঃ এদেশী? আমি ভাবলাম বুঝি বা সাহেব-সুবো ভূত এলো!

গাব গাছের মাথাতেই যথারীতি আড্ডা বসেছে। সভ্যেরা মোটামুটি সকলেই উপস্থিত। অতিথিদ্বয়ও হাজির হয়েছে অনেকক্ষণ। ওরা দুজনে দেশভ্রমণে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছেচে এখানে। ভারতের ভূতেদের মধ্যে একটা প্রীতির সংহতি গড়ে তোলাই ওদের এই স্বেচ্ছাভ্রমণের উদ্দেশ্য।

টাটকা কোলাব্যাঙের মাংস দিয়ে ওদের আপ্যায়ন করা হল। এধরনের খাদ্যের ওদের দেশে তেমন প্রচলন নেই। স্বভাবতই ওরা খুব খুশী হল এই নতুন খাবার পেয়ে। এবং বেশ মৌজ করেই গবাগব তা খেতে শুরু করল।

জলযোগের পাট শেষ হতে আড্ডার চূড়ামণি বিট্রেল ভূত হঠাৎ বলে উঠল, শুনেছি দার্জিলিঙে ঠাণ্ডায় জলজমে বরফ হয়ে যায়। এমনকি বৃষ্টিও

পড়েনা। খবরটা কি সত্যি!

দার্জিলিংবাসী ভূত নুংগা মুচকি হেসে বললে, কে বললে?

বিট্রেল একটু থতমত খেয়ে বললে, শোনা কথা। সত্যি মিথ্যে দুইই হতে পারে। তবে তুমিই বলনা—

নুংগা যেন তাতে একটু খুশীই হল। বললে, শুনতে চাইছ যখন বলি শোন।

নুংগা পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে নাচাতে বললে, আমি বর্তমানে দার্জিলিংবাসী হলেও এসেছি দক্ষিণ ভারত থেকে। ওখানেই আমার আত্মীয় স্বজনেরা আছে।

দার্জিলিং সম্বন্ধে তাদের মুখ থেকে কিছু খবর পেলেও পুরোটা পাইনি। তাই খুবই উৎসুক হয়ে চারদিকে নজর বোলাতে লাগলাম। ভালো থাকার জায়গা একটা খুঁজে বার করাই আগে দরকার।

ওখানে যে কটা পোড়োবাড়ী আছে সব কটিই ভূতের দখলে। সব কটিতে গজিয়ে উঠেছে এক একটা ভূতের হোটেল।

খুঁজে খুঁজে শেষপর্যন্ত বেশ একটা ভালো হোটেলই পেয়ে গেলাম। পরিত্যক্ত ঘরটা ভাঙ্গাচোরা হলেও বেশ সাজানো গোছানো।

ঘরের সুমুখেই ঝুল বারান্ডা। বারান্ডা থেকে সরাসরি হিমালয়ের শোভা দেখা যায়।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম ঘরেতে। অতখানি পথ এসেছি। ক্লান্তি তো আসবেই।

যতখানি ঠান্ডা শুনেছিলাম তেমন কিছু মনে হল না। খানিকটা রেড়ির তেল বুলিয়ে নিলাম দেহেতে। তারপর চানঘরে ঢুকলাম মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে চানটা সেরে নিতে।

সেখানে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! এক ফোঁটা জল নেই কোথাও।

চান না করলেও চলত। কিন্তু তেল মেখেছি। এখন তো চান না করেও উপায় নেই।

তেড়ে গেলাম হোটেলের কর্তাকে। বললাম, হোটেল খুলেছ জল রাখনি। চালাকি নাকি?

হোটেলের কর্তা ছিল বুড়ো এক ব্রহ্মদৈত্য। চোখ বুজিয়ে মনের সুখে গাঁজা খাচ্ছিল। আর থেকে থেকে ব্যোম-ব্যোম বলে চীৎকার করে উঠছিল।

আমি তেড়েমেড়ে এত কথা বললাম বটে, সে কিন্তু গ্রাহ্যই করল না। মনের আনন্দে গাঁজা টেনে যেতে লাগল।

তার ভাবসাব দেখে তো আমার মাথায় খুন চড়ে গেল। আর এক পর্দা গলা চড়িয়ে আবার সেই অব্যবস্থার প্রতিবাদ করলাম।

কর্তার চোখ বন্ধই ছিল। দু আঙ্গুলে ঈষৎ ফাঁক করে বললে, ছোক্‌রা

ভিনদেশী বুঝি!

শুনে আমার মেজাজ আরও চড়ে গেল। অসুবিধায় ফেলে আবার রসিকতা হচ্ছে। হাত থেকে কলকেটা কেড়ে নিয়ে একটা আছাড় মারলাম মেঝেতে। সেটা পড়া মাত্রই গুঁড়িয়ে ময়দা হয়ে গেল। কিন্তু কর্তার মনে সেজন্য কোনও প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ল না।

এবার সত্যিই অবাক হবার পালা। চটে না কেন রে বাবা!

আবার বললাম, পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে গেলাম। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি জলের ব্যবস্থা না করা হয়, ওই কলকেটার যে হাল হয়েছে ওই একই হাল হবে তোমারও।

কর্তাকে তেড়ে প্রায় ঝড়ের বেগে ফিরে এলাম নিজের কোটরে। কিন্তু একি কাণ্ড! ঘরের ভেতরে হাঁটু ডোবা জল।

খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়া কিছু মেঘ থেকে তখনও টপ্-টপ্ করে জল চোঁয়াচ্ছে। ঘরের জিনিসপত্তর সব ভিজে এক্‌সা।

জলের জন্য সবেমাত্র হোটেলের কর্তার পিণ্ডি চটকে এসেছি। আবার কি কখনও ঘরে জল ঢোকার জন্য অভিযোগ করতে যাওয়া যায়।

এখন অত জলের মধ্যে থাকব কি করে। কর্তার অগোচরেই চুপিচুপি কেটে পড়লাম সেই হোটেল থেকে।

নুংগা একমুহূর্ত নীরব থেকে বললে, এইবার বুঝে নাও দার্জিলিঙে বৃষ্টিপাতের ধরনটা কী রকম।

বিট্রেল তার মন্তব্যের জন্য একটু অপ্রস্তুতই হয়েছিল। আমতা আমতা করে বললে, তাহলে তো সাংঘাতিক বলতে হবে।

চেরাপুঞ্জিবাসী ভূত চুংগি মিট-মিট করে হাসছিল। সেটা বিট্রেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাকে লক্ষ্য করে বললে, তুমি হাসছ যে বড়।

চুংগি একটু তোতলা ছিল। বললে, এই বৃষ্টিই যদি তোমাদের কাছে সাংঘাতিক মনে হয় তাহলে আমাদের ওখানে বৃষ্টির ধরন দেখলে কি করবে।

তার মুখ থেকে এই কথা খসা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তাকে চেপে ধরল তা শোনানোর জন্য। চুংগি তখনও একটা ব্যাঙের মাথা চিবোচ্ছিল। ইশারায় একমিনিট ধৈর্য ধরতে বললে সকলকে।

বেশ একটু গুঞ্জন শুরু হল আড্ডায়। নুংগার অভিজ্ঞতা নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছিল আড্ডার সভ্যদের মধ্যে। কত জোর বৃষ্টি হলে দেড়মিনিটে এক হাঁটু জল জমতে পারে, সেই কথা নিয়ে তারা জল্পনা কল্পনা চালাচ্ছিল নিজেদের মধ্যে।

কাঁচ ব্যাঙ। তাই চিবিয়ে খেতে বিশেষ সময় লাগল না। হাত দিয়ে মুখ পুঁছতে পুঁছতে বললে, চেরাপুঞ্জিতে যেদিন আমি প্রথম এলাম, সেদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল। পরিষ্কার নীল আকাশ জুড়ে ছিল সূর্য।

আর সেই সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল গোটা শহরখানা।

যে পোড়ো বাড়ীটায় আমরা উঠেছিলাম সেটা উচ্চতায় প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মতো উঁচু। এক ব্যবসায়ী বহু টাকা খরচ করে সেটা বানিয়েছিল। কিন্তু ভোগ করতে পারেনি।

দরজায় তালা লটকে পালিয়ে গিয়েছিল। আর সেই সুযোগেই ওটা ভূতেদের দখলে এসেছিল।

চিলে কোঠাটাই পেয়েছিলাম আমি। ঘরটা ভালোই। ঋজু ঋজু জানালা। তবে জানালাগুলো দীর্ঘ কয়েক বছর না খোলার জন্য জঙ ধরে সব আটকে গিয়েছিল।

গাছের মাথায় খোলা মেলা জায়গায় আমার থাকা অভ্যাস। অমন বদ্ধ ঘরে থাকতে পারব কেন। হাঁফ ধরতে লাগল।

রেগেমেগে জানালা খোলায় মেতে গেলাম। কিন্তু কারসাধ্যি সেই মরচে ধরা জানালা খোলে। নতুন অবস্থায় যেখানে যা রঙ দেওয়া হয়েছিল, সেই রঙেই সেঁটে গিয়েছে কাঠের অংশগুলো। একটা লোহার রড খুঁজে বার করে পিটে পিটে জঙ ছাড়ালাম। জানালা খুলে দেখি একটাও গরাদ নেই।

খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত বেশ ভালোই। দেশী বিদেশী সব খানাই মেলে সেখানে।

আমি অবশ্য পনির মাংসই বেশী পছন্দ করলাম। এসব জায়গায় অবশ্য পনির চলন বেশী। সারাদিন পথভ্রমণের ক্লান্তি ছিল শরীরে।

নতুন জায়গায় খানিকটা ঘোরাঘুরি করে এসে গা এলিয়ে দিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়ালই নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কানের কাছে টক-টক করে একটা শব্দ হচ্ছে।

এতজোর শব্দ যে কানে প্রায় তালা ধরার যোগাড়। তাছাড়া পিঠেও যেন কিছু একটা ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে লাগছে।

চোখ খুলতেই অবাক কাণ্ড। সেন্ট্রাল টাওয়ারের ঢাউস ঘড়িটা আমারই মুখের সমুখে দুলছে। প্রথমে মনে হল হয়ত বা পনির খাওয়ারই প্রতিক্রিয়া।

সকলের পেটে তো সব জিনিস সয়না। আবার চোখ বুজলাম। চোখ খুলতেই সেই একই দৃশ্য। পেন্ডুলামটা যথারীতি টক-টক করছে।

এবার আর চোখ বন্ধ করলাম না। চোখ নীচে নামাতেই তাজ্জব কাণ্ড। খালি জল আর জল। আমি তার ওপরে ভাসছি।

সে একমুহূর্ত নীরব হতেই মগডাল থেকে একজন প্রশ্ন করল ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল দাদা। হেঁড়ে মাথায় ঢুকছে না তো কিছুই।

একবার সে তার মুখের দিকে তাকাল। না বোঝারই কথা। আসলে

সারারাত এত জল হয়েছিল যে জল তিনতলা পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। অথচ আমি কিছুই জানতে পারিনি।

এদিকে ঘরের জানালা খোলা থাকার দরুন ঘুমন্ত অবস্থাতেই আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছিল গরাদ বিহীন জানালার ভিতর দিয়ে।

আমি ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকেছি সেন্ট্রাল টাওয়ার ক্লকের গায়ে। আর তখনই মাথার ওপর ঘড়ির টক-টকানি শুনতে পাচ্ছিলাম।

ক্রমশ আমার চিন্তা স্পষ্টতর হল। তখনই বুঝলাম বাড়ীর জানালাগুলো সব পাকাপাকিভাবে বন্ধ কেন। ওগুলো না খুললেই হত। তাহলে আর আমায় এই দুর্বিপাকে পড়তে হত না।

চেরাপুঞ্জিবাসী ভূতেদের মুখ থেকে তাদের অভিজ্ঞতা শোনার পর সকলেই বিট্রেলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। আড্ডায় ওদের বলার উত্তরে কিছু একটা না বললে মানাচ্ছে না।

বিট্রেল বসে দাঁতে নখ কাটছিল। বন বাদাড়ে তাদের জীবন কাটছে। বৃষ্টির অভিজ্ঞতা তার প্রচুরই রয়েছে। কিন্তু কোনটা বলা যে জমাটি হবে সেটাই চিন্তা করছিল সে।

ইতিমধ্যে অনেকেই অনেকরকমভাবে তাকে ইশারা করতে লাগল। কেউ গাছের ডাল নাড়াল, কেউ হনুমানের মত মুখে হুপ্ হুপ্ শব্দ করল, কেউ শিস দিতে লাগল।

সকলেরই উদ্দেশ্য মহৎ। সকলেই চায় বিট্রেল এই গল্পের আডডাটা মধুরেন সমাপয়েৎ করুক।

বিট্রেল খুবই চতুর। সে সবকিছু উপলব্ধি করেই শুরু করল।

আমি একবার মালয় গিয়েছিলাম। ওখানে আমার এক বন্ধু ছিল। তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

স্টেশন চৌহদ্দিতে পেঁৗছে দেখি শহরে চারদিকে কেবল বিজলী বাতি জ্বলছে।

প্রথম গিয়েছি। সবকিছু অজানা-অপরিচিত।

এলোমেলো ঘুরছি। স্ব-জাতি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি।

হঠাৎ একজনের সঙ্গে মুখোমুখি হলাম। সে আড়ে আড়ে আমার দিকে তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল। ইশারা করতে এগিয়ে এল।

এক বন্ধুর নাম বলে বললাম, তুমি কি এর পাত্তা দিতে পার?

সে অনেকক্ষণ ভাবল। নাক সিঁটকে বললে, নামটা খুবই চেনা ঠেকছে। কিন্তু কোথায় থাকে তা তো বলতে পারব না।

বললাম তাকে আর একবার স্মরণ করতে। সে বলল, সম্ভব নয়। কদিন

রোদ বেরুচ্ছে না। আমার স্মরণশক্তি এখন ভিজে ঢব-ঢব করছে। না শুকালে কিছুই মনে আসবে না।

কি সব্বনেশে কথা। তাহলে তো রোদ না বেরুনো পর্যন্ত কিছুই জানা যাবে না। আর কেউ নেই যে তার সাহায্য চাইব।

তার মুখ চেয়েই পড়ে রইলাম। সে অবশ্য আমার দুরবস্থা অনুভব করল। বললে, মন খারাপ করে বসে থেকে কি করবে! চল বরং তোমায় শহরটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

ভালোই লাগল তার প্রস্তাবটা। বললাম, আমি তো এখানে কখনও আসিনি। কিছুই জানিনা। কি কি দেখার আছে এখানে?

সে অনেক কিছুরই নাম বলল, সঙ্গে সঙ্গে আকাশের কথাও বললে।

আকাশ দেখাবে শুনে আমি একটু অবাকই হলাম। আকাশ দেখাবার কি আছে। চোখ তুললেই তো আকাশ দেখা যায়। হয়ত বা এখানে রাতের অন্ধকার থাকার জন্যই আকাশ চোখে পড়ছে না।

আমি বললাম, আকাশ দেখতে তোমার সাহায্য কেন লাগবে?

সে বললে, এখান থেকে তোমায় প্রায় শখানেক মিটার রকেটে চড়ে ওপরে উঠতে হবে। তবেই আকাশ দেখতে পাবে।

একশ মিটার, বলকি! তা এই একশ মিটার কি আছে?

সে হাসল। কি আবার। খালি জল। অনবরতই বৃষ্টি হচ্ছে আর জলের ওপর জল জমছে। বাড়ী ঘর গাছপালা সবই ডুবু ডুবু।

তাই মানুষ বুদ্ধি করে জলের নীচে ঘরবাড়ী বানিয়েছে।

এখানে সূর্যের আলো সরাসরি ঢুকতে পারে না বলে সর্বদাই বিজলী বাতি জ্বলে। এখন নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছ রকেট চড়ে আকাশ দেখতে যাওয়ার কারণ।

দার্জিলিং আর চেরাপুঞ্জিবাসী ভূত নুংগা আর চুংগি হঠাৎই বিট্রেলের দুপায়ে দুজনে মাথা কুটতে লাগল।

বিট্রেল একটু অপ্রস্তুতই হল। যতই হোক অতিথি তো তারা। তাদের পক্ষে পায়ে মাথা কোটা শোভা পায়না।

সে যত বলে ছাড়-ছাড়, তারা ততো চেপে ধরে।

এবার বিট্রেল একটু ঘাবড়ে যায়। কীরে বাবা পা-ফা মুচকে দেবে নাকি?

বিট্রেল এবার গলার স্বর খুব মোলায়েম করতেই ওরা দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়ল। বললে, গুল মারার গুরু হলে আজ থেকে তুমি আমাদের।

এতদিন আমাদের ধারণা ছিল এদেশে আমরাই বুঝি টপ।

ওরা একথা বলামাত্রই আড্ডার সকলে হিঁ—হিঁ—হিঁ করে হাসতে হাসতে হাততালি দিতে লাগল।

পুরস্কার

ভূতি নাকি শৈশবে একবার গপ্প বানানোয় প্রথম হয়েছিল।

এ খবর এতদিন কেউই জানত না। সেদিন কথায় কথায় সে কথা বলে ফেলতেই কিম ভূত তো হেসেই অস্থির। হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে বললে, তোর মুখের গপ্প। তার আবার পুরস্কার! এমন খবর গোপন রাখাই উচিত ছিল তোর। প্রকাশ না পেলেই দাম হত বেশী।

কিম ভূত সুযোগ পেলেই ভূতির পিছনে লাগে। স্বভাবতই সুযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে যথারীতি তার পিছনে লাগতে শুরু করল।

ভূতি মুখে একটা মৃদু হাসির প্রলেপ মাখিয়ে রাখলেও মনে মনে সে খুবই চটে গিয়েছিল। বেশীক্ষণ আর সে ধৈর্য রাখতে পারল না। বেশ উত্তেজিত হয়েই বলে উঠল, আমি তো এখন অসত্য কিছু বলিনি। তোর এত হাসি পাবার কী আছে! আমি কি মিথ্যা কথা বলছি? গপ্প বলাকি খুব কঠিন কাজ। চেষ্টা করলে যে কেউই বলতে পারে। কেবল বানানোটাই যা কঠিন। তা তুইও তো চেষ্টা করে দেখতে পারিস। তোতে আমাতে তাহলে দ্বৈত গপ্প বলার আসর বসাতে পারি এবং সেটা একটা ঘটনাও হবে ভূতের রাজত্বে। কিম ভূত মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেল। বিড় বিড় করে বললে, আর গপ্প বলে কাজ নেই। একবার ভক্তদের পীড়াপীড়িতে গপ্প ফাঁদতে গিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম সে আর কহতব্য নয়।

ব্রহ্মদৈত্যির গপ্প তো ফেঁদে বসলাম। তারপর তাকে নিয়ে যে কি করি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।

আর ভূতেদের ধৈর্য তো জানিস। দুদণ্ড কেউ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না।

আমাকে আমতা আমতা করতে দেখে ভক্তরা তো চটে আগুন। প্রথমে তারা নানারকম কুস্বর করতে শুরু করল। তারপর চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। অবশেষে ভাঙচুর!

একদল চ্যাংড়া ভূত পেতনি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, যদি গপ্প বলার ইচ্ছা থাকে তো তাড়াতাড়ি বলে ফেল। আর যদি না পারিস তো ব্রহ্মদৈত্যিকে কোলে নিয়ে বসে থাক। আমরা সরে পড়ি।

বুঝলাম হাওয়া খুবই খারাপ। ভক্তদের মাথার পোকা একবার নড়ে উঠলে আর থামে না। ওদের শান্ত করার জন্য বললাম ব্রহ্মদৈত্যির হঠাৎ পেট খারাপ হয়েছে। তাকে আর টানাটানি করা উচিত হবে কিনা ভাবছি।

আমার সে চালে বিশেষ কোনও ফল হল না। তারা কি বুঝল কে জানে। ভাব বলে তারা সবাই উঠে চলে গেল।

আমিও বাঁচলাম! কিম ভূত মুচকি হাসল।

কিম ভূতের অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতে ভূতি হাসছিল। সে নীরব হতে বলল, আমি আগে থেকেই গপ্পটা ভেবে নিয়েছিলাম। তাই বিশেষ কোনও অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

কিম ভূত হাসল। তাহলে আজ আর আড্ডায় যাচ্ছিনে। তোর গপ্পটাই শোনা যাক কী বল।

ভূতি বললে, বলতে পারি একই শর্তে। শুনে ঠাট্টা করতে পারবি না—। পিছনে লাগা তোর একটা স্বভাব। সে ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা বাবা তাই—ই।

ভূতি তখনই গপ্প শুরু করল। তখন আর আমার বয়স কতইবা হবে, খুব বেশী হলে তিন থেকে চারশ' বছর।

দূর সম্পর্কে এক শাঁকচুন্নি পিসি ছিল। পিসি কিছুদিন এক লেখকের কাঁধে চেপে বসে থেকে গপ্প শুনতে শুনতে খুবই গপ্পের ভক্ত হয়ে পড়ে। সেই লেখককে ছেড়ে দিয়ে পিসি ভূতেদের মধ্যে গপ্পকার হবার সদিচ্ছা জাগানোর জন্য একটা প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করে।

আর সেই সূত্রেই আলাপ আলোচনা চালানোর জন্য একদিন এসেছিল আমার কাছে। বিশেষ গৌরচন্দ্রিকা না করেই বললে, গপ্প বলা প্রতিযোগিতা করছি। নাম দিবি নাকি? দারুণ সব পুরস্কার।

পিসির কথা শুনে হাসি পেল।

বললাম গপ্পের 'গ'—ই জানি না, গপ্প বলব কী করে?

পিসি বললে, ধ্যুৎ! ভয় পেলেই ভয়। মানুষ হোক্, ভূত হোক্ আর জন্তু জানোয়ারই হোক্—এদের নিয়ে একনাগাড়ে কিছুক্ষণ বকে যেতে পারলেই তো গপ্প।

গপ্প বলে আবার আলাদা কিছু আছে নাকি!

এই যে আমরা দিনরাত গাছে বসে বকবক করি—এও তো এক রকমের গপ্প। এরকম কিছু একনাগাড়ে বলে যেতে পারলেই হবে।

বকবক করেই যদি একটা পুরস্কার পেয়ে যাস তাই বা মন্দ কি। কতদিন আর ভূত হওয়ার দুর্নাম ঘাড়ে নিয়ে পড়ে থাকবি। যাহোক্ একটা কিছু করতে হবে তো……

পিসি একতড়পা সবকিছু বলে যাবার সময় জানিয়ে গেল আর ভাবতে হবেনা তোকে। আমি প্রতিযোগীর তালিকায় তোর নাম তুলে দিই—

পিসি তো বলে চলে গেল। কি আর করি গপ্পের বিষয় ভাবতে লাগলাম।

এদিকে প্রতিযোগিতার দিন যতোই এগিয়ে আসতে লাগল বুক ধড়পড়ানিও ততো বাড়তে লাগল।

হাত পা এমনই কাঁপতে শুরু করল সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত রইল না। দাঁড়াতে গেলেই মাথা ঘুরে যেতে শুরু করল।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কী হবে কী হবে।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পাচ্ছি না, গপ্প বলা তো দূরের কথা।

বাঁশ বাগানের চুমকি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

আমার দুরবস্থা দেখে সে বলল, অযথা ভেবে ভেবে তুই দুর্বল হয়ে পড়েছিস। প্রতিযোগিতার আগে কদিন একটু ভালোমন্দ খা দেখবি সব দুর্বলতা কেটে যাবে।

বললাম, কি খাব বল। আমাদের তো আর মুদিখানা নেই, এখান সেখান থেকে রীতিমত খুঁটে এনে খেতে হবে।

চুমকি মুচকি হাসল। সকালে দুটো করে বকের ডিম আর এক মগ করে বাঘের দুধ খা তো দেখি। দেখি তোর শক্তি না বাড়ে কেমন!

শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। বকের ডিম না হয় ঘোরাঘুরি করেও যোগাড় করলাম। বাঘের দুধ এখন পাই কোত্থেকে?

সে বললে, তুই না পারিস আমি যোগাড় করে দেব। রাতগভীরে জঙ্গলে ঢুকব। ঘুমন্ত বাঘিনীর বাঁট থেকে চুষে নিলেই চলবে। বাসায় আর বয়ে আনতে হবে না—

কথা রাখল। দিলেও কদিন!

দেখতে দেখতে প্রতিযোগিতার দিন এগিয়ে এল। প্রতিযোগিতা প্রাঙ্গনে হাজির হয়ে দেখলাম তা প্রায় শ' পাঁচেক ভূত পেত্নি সাগ্রহে অপেক্ষা করছে সেখানে। আমি তাদের মধ্যেই একটু জায়গা করে নিয়ে বসে পড়লাম।

বিচারকেরা হাজির হতেই এক এক করে প্রতিযোগীদের ডাক পড়তে লাগল।

আমার নাম ধরে ডাকতেই মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বিচারকদের সামনে হাজির হলাম।

পিসি ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে দেখা মাত্রই চীৎকার করে উঠল, পেথ্থম হওয়া চাই—

সাতটা ঢোক গিললাম পরপর। গলা আমার শুকিয়ে কাঠ। ওর মধ্যেই শুরু করলাম ঃ

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাঘেরা দেখল তাদেরই এক বন্ধুর মাথার দুদিকে বাঁকা বাঁকা দুটো লম্বা শিং গজিয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যেই সে খবর ছড়িয়ে পড়ল গুহার মধ্যে। চারদিক থেকে

অন্যান্য বাঘেরা ছুটে আসতে লাগল এই খবর সত্য কিনা যাচাই করতে।

এদিকে সে বাঘের অবস্থা খুবই কাহিল। কয়েক হাজার চোখ তার প্রতি নিবদ্ধ। সব চোখেই কৌতূহল। তা ছাড়াও রকমারি মন্তব্য উড়ে আসছে তাকে লক্ষ্য করে।

একটা বুড়ো বাঘ গোঁফ নাচিয়ে বলল, সে আর এখন বাঘ নেই। বিড়াল হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একজন পাশ থেকে মন্তব্য করল, বিড়ালের আবার শিং থাকে নাকি? বরং হ-রি-ণ বলতে পারিস। হরিণই তো শিঙের জন্য বিখ্যাত।

ওই হল। বুড়ো বাঘ মুচকি হাসল। হেসে বলল, ওকে আর আমরা বাঘ বলে ডাকতে রাজী নই। ওকে আপাতত একঘরে করেই রাখা হোক।

বুড়ো বাঘের নির্দেশ শুনে তো সে থ'।

ইস্ এমন দুর্ভাগ্য যে তার কপালে লেখা আছে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তাকে একঘরে করে দিলে সে আশ্রয়ই বা নেবে কোথায়?

অগত্যা সে সেই বুড়োকে সাধাসাধি করতে শুরু করল। কিন্তু বুড়ো বাঘ তার কথায় কর্ণপাত করল না। বরং আরও চটে গিয়ে অনতিবিলম্বে তাকে গুহা ছাড়ার নির্দেশ দিল।

সে দেখল আর কোনও উপায় নেই। এই বুড়ো অসম্ভব জেদি। দ্বিতীয়-বারেও না বলেছে যখন, এখন গুলি করলেও একচুল নড়বে না।

সে শিঙ নাড়তে নাড়তে বনের পথ ধরল।

দীর্ঘ পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যখন সে এক ঝর্ণা থেকে জল পান করছিল হঠাৎ কোত্থেকে শ'খানেক হরিণ এসে তাকে ঘিরে ধরল। এবং তাকে প্রদক্ষিণ করে নাচতে শুরু করল।

এত হরিণ সেখানে সে কোনদিনও দেখেনি। স্বভাবতই সে বুঝে ফেলল, সে নিশ্চয় কোনও হরিণের দেশে এসে পৌঁছেচে।

হরিণেরা এতক্ষণ নতুন বন্ধু পেয়ে বেশ মনের আনন্দেই নাচছিল। হঠাৎ তাদের ভাগ্য বাদ সাধল। ভীড়ের মধ্যে থেকে একটা হরিণ মুখ বাড়িয়ে বলল, ওরে ওটা হরিণ নয় রে। ছদ্মবেশী বাঘ। দেখছিস না লেজখানা কি লম্বা। হরিণ সেজে আমাদের ঘাড় মটকাতে এসেছে।

একজন বললে. ধ্যুৎ! বাঘ না ছাই। বাঘের কানের পাশে কি ফুটো থাকে যে সেখানে শিং গজাবে। ও আসলে হরিণই। কোনও বাঘের গুহায় মানুষ হয়েছে বলেই হয়ত হাবভাবটা বাঘের মত হয়েছে।

একটা বয়স্ক হরিণ বললে, অত কথার দরকার কি আছে। চল ওকে বরং আমাদের সর্দারের কাছে নিয়ে যাই। সে যা বুঝবে তাই করবে।

আমরা আর অকারণ অত ঝুঁকি নিতে যাই কেন?

এই প্রস্তাবে সকলেই রাজী হল। তারা বাঘকে নিয়ে সর্দারের বাসায় চলল।

সর্দার তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে খেলছিল। অনুচরেরা গুঁতো মারতে মারতে তাকে হাজির করল তার সম্মুখে।

দূর থেকে সর্দারের লক্ষ্য পড়েছিল। কাছে হাজির হতেই সর্দার সব ঘটনা শুনে তারদিকে একবার কটমট করে তাকাল। বললে, এ বাঘ হতে যাবে কেন। হরিণ—

সর্দারের সঙ্গীসাথীরাও নিরীক্ষণ করছিল। দুবার ঘ্রাণ টেনে তারা প্রায় নিঃসঙ্কোচেই বলল উঁহু, এ হরিণের গায়ের গন্ধ নয়। বাঘই হবে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—কিছু কিছু মিল তো রয়েছেই, তাছাড়া গায়ের গন্ধটাও খুব পরিচিত। আমরা যেবার বাঘের পাল্লায় পড়েছিলাম এমনই গন্ধ পেয়েছিলাম তার গা থেকে।

সর্দার কিন্তু তাদের কথায় রাজী হল না। সে অবিরাম মাথা নাড়তে লাগল। হঠাৎ চীৎকার করে বলল, কিছুতেই না।

বাঘ মেরে মেরে হদ্দ হয়ে গেলাম। আর তোরা কিনা বলছিস—

সঙ্গীরা কিন্তু তাদের মতে অনড়। তারা বললে—ভুল নয়!

'হ্যাঁ ভুল'।

না ভুল নয়!

তাদের এই বাকবিতণ্ডা শুনে আশে পাশের ঝোপ জঙ্গল থেকে অনেকেই উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করল।

ক্রমশ তারা দলবিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল সমর্থন করল সর্দারকে আর একদল তার সঙ্গীসাথীদের।

তার পরিণতি ভালো হল না। তর্কাতর্কি চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত মারামারি বেঁধে গেল দুই দলের মধ্যে।

এ পক্ষ ওপক্ষকে মারে তো অপরপক্ষ এ পক্ষের একজনকে মারে।

এ পক্ষের সমর্থক কমলেই অপর পক্ষের সমর্থন কমে। অপর পক্ষের একজন কমলেই এ পক্ষের একজন কমে।

তাদের সংখ্যা কমতে কমতে শূন্য ছুঁই ছুঁই!

বাঘ দেখল এই সুবর্ণ সুযোগ।

বারো হাত একটা লাফ মেরে সেই উচ্চাসনে উঠে, নিজেকেই সেখানকার রাজা বলে ঘোষণা করল।

প্রতিবাদ করার মত কেউই সেখানে ছিল না।

ক্রমশ সে খবর পেঁছিল বাঘেদের কানে।

প্রথমে তারা বিশ্বাস করতেই চাইল না। এত সহজে রাজসিংহাসন দখল

করা এ যে স্বপ্নাতীত ব্যাপার।

তারা দলে দলে চর পাঠাতে লাগল প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য।

খবর নিয়ে তারা একে একে ফিরতে লাগল। যে খবর বাজারে রটেছে তা আজগুবি নয়। সত্যি সত্যিই বাঘ সিংহাসনে বসেছে। এবং সকলে তাকে মান্য করতে শুরু করেছে।

ভূতি গল্প বলা শেষ করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

কিম ভূত প্রায় দম বন্ধ করেই তার গল্প শুনছিল। তাকে হাসতে দেখে বললে, প্রতিযোগিতায় কিছু হতে পেরেছিলিস?

ভূতি বুক টান টান করে বললে, ফ্যাস্ট!

কিম ভূত নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দিল তার সাথে করমর্দনের জন্য।

মাংসের নামগন্ধহীন কখানা হাড় রাখাছিল কিম ভূতের জন্য।

সারাদিন এখান ওখান চরে, ফিরে এসেই সেই খটখটে শুকনো হাড় চুষতে হবে শুনে ভূতের প্রচণ্ড মাথা গরম।

হাড় কখানা তুলে নিয়ে এক এক করে ছুঁড়ে ফেলে দিল পানাপুকুরে। তারপর রাগে গজগজ করতে করতে গুম মেরে বসে রইল গাছের মগডালেতে।

ভূতি তখন ছিল না। গিয়েছিল পাশের পানাপুকুরে চান করতে।

নিশ্চিন্ত মনেই সে তার কাজ সারছিল। হঠাৎ আকাশ দিয়ে দুচারটে মাংসের হাড় এদিক ওদিক ছুটতে দেখেই তার টনক নড়ল। তাড়াতাড়ি জলে ডুব দিয়েই দৌড়তে শুরু করল নিম গাছের উদ্দেশে।

গাছের নীচে পেঁৗছে কিম ভূতের উদ্দেশে বললে, খাবারগুলো নষ্ট করছিস কেনরে? খেতে না ইচ্ছে হয় রেখে দে, ফেলে দিবি কেন? অন্য কাউকে দিলেও তো দুচার কড়ি পাওয়া যায়।

কিম ভূতের মেজাজ তেতেই ছিল। ভূতির খোঁচা খেতেই তেড়েফুঁড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মাংসগুলো খুলে খুলে খেয়ে নিয়ে হাড়গুলো রেখে দিয়েছিস আবার কথা বলছিস। এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলি। কাছাকাছি ছিলিস না তাই। না হলে—

না হলে কি করতিস? ভূতি ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

কী আবার করতাম। দু-ঘা দিতাম—

মারার কথা বলতেই ভূতি ফঁস্ করে উঠল। আর একটু দেরী হলেই সে হয়ত বা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ত মাটিতে।

কিন্তু পাশের গাছের মুংলি সেই সময় এসে পড়ায় সাময়িকভাবে বিবাদে বাধা পড়ল। মুংলি বয়স্ক হওয়ার দরুণ উভয়ে তাকে মান্য করে। দুজনের কথা শুনে সে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে ভূতির পক্ষেই রায় দিল।

তখনকার মত সে রায় মেনে নিলেও কিম ভূত কিন্তু মনে মনে গজরাতে লাগল। ঠিক করল আর একমুহূর্ত সেখানে থাকবে না। ওর অন্ন খাবে না। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবে।

ভূতি গিয়ে পা ধরে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত বাসায় ফিরবে না।

সেই দিনই সে বেরিয়ে পড়ল এক অজানা উদ্দেশে।

বনের পথ ধরে সে হাঁটছে তো হাঁটছেই। খাল-বিল, পুকুর-নালা, চড়াই-উৎরাই অনেক কিছুই তার সামনে পড়ছে কিন্তু তার গতি ব্যহত করতে পারছে না।

জিদভরেই সে পেরিয়ে চলেছে একের পর এক বন জঙ্গল।

সে আর কতক্ষণ পারা যায়। ক্রমশ ক্লান্তি নামে তার সর্বাঙ্গে। এদিকে সূর্য মধ্যগগনে পেঁাছানোর ফলে তপ্ত সূর্যকিরণও অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

সে ভাবল কিছুক্ষণ বরং বিশ্রাম নেওয়া যাক।

সুমুখেই একটা দীর্ঘকায় খেজুরগাছ ছিল। কিম ভূত তর্ তর্ করে সেই গাছের মাথায় উঠে গিয়ে আরামে হাত পা ছড়িয়ে দিল এবং নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করল।

দীর্ঘপথ হাঁটার ফলে ঘুমটা বেশ জাঁকিয়েই এসেছিল তার দুচোখে। কতক্ষণ যে এভাবে কেটে গিয়েছিল তার খেয়ালই ছিল না।

হঠাৎ কট্ কট্ করে একটা আওয়াজ শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে দেখল প্রায় গঙ্গাফড়িং-এর মত বড় বড় কটা মশা কট্ কট্ করে হুল বসাচ্ছে তার দেহে।

মশার কামড় যে সে আগে কখনও খাইনি তা নয়। তখন সে ভূতিকে লাগিয়ে দিত মশা তাড়ানোর কাজে।

এখন কে আর তাকে সাহায্য করবে। যা কিছু করার তাকে নিজেকেই করতে হবে। মশা তাড়াতে তাড়াতে ভাবছিল গোরু ঘোড়ার মত যদি তারও একটা লেজ থাকত তাহলে কি মজাই না হত।

লেজ নাড়িয়ে সে সহজেই মশার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেত।

টেনে ঘুমটা দেওয়ার ফলে শরীরখানা বেশ ঝরঝরেই হয়ে গিয়েছিল তার। আড়মোড়া ভেঙ্গে শরীরটাকে সচল করে নিয়ে আবার সে সুমুখ পথে হাঁটতে শুরু করল।

খুশী মনে হাঁটলেও খাবারের সন্ধান করতে সে ভোলেনি।

যেতে যেতে প্রায় সে ঝোপঝাড়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল। তার পছন্দসই খাবার কোথাও তেমন কিছু চোখে পড়ছিল না।

তবে বেশীক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হল না।

সামনেই একটা পাতলা বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটা বুনো মোষ একটা টাট্টু ঘোড়ার পেটের মধ্যে তার ছুঁচলো শিঙ দুটো ঢোকাবার চেষ্টা করছে।

ঘোড়ার মাংস চিরকালই কিম ভূতের খুবই প্রিয়।

ঘোড়ার মাংসের নামে তার লাল ঝরে। তবে ঘোড়া সহজে মেলেনা বলেই বড় একটা খাওয়া হয়ে ওঠে না।

ভূতি অবশ্য কয়েকবার তাকে এনে খাইয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগই বুড়ো ঘোড়া হওয়ার জন্য খেয়ে ঠিক তৃপ্তি হয়নি।

স্বভাবতই টাট্টু দেখে খুশীতেই তার মনটা নেচে উঠল। মোষটার কল্যাণে যদি কচি ঘোড়ার মাংস খাওয়া যায় মন্দ কি।

সেও ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল সেদিকে। কিন্তু কাছাকাছি গিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘোড়াটা আপ্রাণ লড়ছে বাঁচার জন্য।

কিম ভূত ভাবল মোষ যদি ঘোড়াকে একান্ত কাবুও করে, তাকে ভোগ করতে দেবে কেন? সেই কামড় বসাবে।

একমাত্র সে যদি ঘোড়াটাকে বাগে আনতে পারে তবেই তার আশা পূর্ণ হবে।

সাতপাঁচ অনেককিছুই ভাবল সে। অবশেষে মোষের রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে, আবার সমুখে এগুতে শুরু করল সে।

ভাবল ইস্ আমার যদি ওই মোষের মতো দুটো ছুঁচলো শিং থাকত আমিও কাউকে ভয় পেতাম না। প্রতিদিনই একটা করে ঘোড়া মেরে কষা মাংস খেতে পারতাম!

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হল।

কিম ভূতের পা আর চলতে চায় না। সামনেই একটা পুরানো কালী মন্দির। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় পুজো শেষ হয়েছে।

কপাট ভেজানো থাকলেও ফাঁকফোকর দিয়ে ভুর ভুর করে ধূপের গন্ধ আসছে।

কিম ভূত কপাট ফাঁক করে উঁকি মারল।

কেউ নেই ভিতরে। তবে কিছু কাটা ফলমূল ইতঃস্তত ছড়ানো রয়েছে মেঝেতে।

ফলে তার রুচি নেই। এই মুহূর্তে সেই সুযোগ ছাড়তেও অবশ্য তার ইচ্ছা করল না। সে ঢুকে পড়ল মন্দিরে। এবং গব গব করে সেগুলো খেতে লাগল।

খেয়ে দেয়ে সে ভাবল এবার এখানে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক।

মন্দিরের ঠাণ্ডা পরিবেশে হঠাৎ তাকে ঘুমে ধরল। ঘুমোবে কিনা চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল তার খেয়াল রইল না।

ঘুম ভাঙ্গল যখন জমাট অন্ধকারে মন্দির ডুবে গিয়েছে। কিম ভূতের অবশ্য সেজন্য কোনও অসুবিধা নেই।

রাত্রি তো চিরকালই তাদের প্রিয়। অন্ধকারে মিশে যাওয়ার ফলে তাদের কেউই দেখতে পায় না। কিন্তু তারা সবাইকে দেখতে পায়।

হঠাৎ মায়ের মূর্তির প্রতি চোখ পড়তেই সে চমকে উঠল। মা সজীব

হয়ে উঠেছেন। এমন সুযোগ আসবে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। কী করবে ভেবে না পেয়ে সে সাষ্টাঙ্গে মায়ের পদতলে প্রণাম ঠুকল।

তার ফল শুভই হল। মা খুশীই হলেন। হাতের খাঁড়াটা দুবার ঝাঁকিয়ে বললেন, বৎস তোর পদসেবায় আমি প্রীত। কীসের দুঃখে তুই এই মন্দিরে এসে হত্যা দিয়েছিস?

কিম ভূত দেখল ব্যাপার মন্দ হয়। মা যখন স্বেচ্ছায় অনুগ্রহ দেখাতে চাইছেন, সুযোগটা ছেড়ে দিই কেন। বললে, মা আমি বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে খুবই বিপদে পড়েছি।

আরও কিছু সে বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে মা বললেন, বুঝেছি আমার পায়ে যে তিনটে জবা ফুল রয়েছে তুলে নে।

এই এক একটা ফুল তোর এক একটা ইচ্ছা পূরণ করবে। মোট তিনটে ইচ্ছে পূরণ হবে। কথাগুলো বলেই মা পুণরায় মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন।

বাকি সময় আর ঘুম হল না তার। শুয়ে শুয়ে সে অনেক কথাই ভাবতে লাগল। একবার ভাবল মানুষ হলে কেমন হয়?

পরমুহূর্তেই মনে হল থাক দরকার নেই। মানুষ হলে তাকে আবার শৈশবে হামাগুড়ি টেনেই জীবন শুরু করতে হবে। তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী।

বরং বুনো জন্তুজানোয়ার মেরে খাওয়ার জন্য একজোড়া শিং আর মশার কামড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটা বড় লেজ চাওয়া যাক।

আপাতত তাতেই অনেকখানি সুখ পাওয়া যাবে।

মনস্থির করেই সে দুটি ফুল হাতে নিয়ে তার মনস্কামনা ব্যক্ত করল। সঙ্গে সঙ্গেই কাজ হল। ফুল দুটি তার ইচ্ছাপূরণ করে ঝরে পড়ল মাটিতে।

কিম ভূতের আনন্দের আর সীমা রইল না। এত তাড়াতাড়ি যে এরকম একটা সৌভাগ্যের অধিকারী হবে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

সে আর বিশেষ এগুলো না। সাত পাঁচ চিন্তা করে বাসার পথেই পা বাড়াল।

কিম ভূত ফিরতে ভূতি খুশীই হল। আগের চাইতে অনেক বেশী আদর যত্ন করতে শুরু করল তাকে।

এরপর বেশ কিছুকাল কেটে গিয়েছে। শিং থাকার ফলে কিম ভূতের এখন দুবেলা ভাল খাবার যোগাড় করা কোন সমস্যাই নয়।

যেদিন যা খেতে ইচ্ছে হয় আচমকা শিং দিয়ে তার পেট ছেঁদা করে দেয়। নাড়িভুঁড়ি ফেলে টানতে টানতে বাসায় নিয়ে আসে। তারপর দুজনে মনের আনন্দে তা কুচিয়ে ভুরিভোজন করে।

এ তো গেল, শিং লেজের উপকারও কম নয়। এখন আর রাত্তিরে মশার কামড়ে তাদের ছটফট করতে হয় না।

কিম ভূত শুয়ে শুয়ে সারাক্ষণই লেজ নাড়ে। তাতে মশার উৎপাত অনেক কমে গিয়েছে।

সেদিন গাছের মাথায় গরম লাগছিল বলে ওরা দুজনেই নেমে এসেছিল গাছ থেকে। এবং গাছের গোড়ায় বসে পুরানো দিনের গল্প ফেঁদেছিল।

চাঁদের মিষ্টি আমেজে কখন যে তারা দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই।

হঠাৎ কিম ভূত 'হাঁউ—মাউ—খাঁউ' বলে চীৎকার করে উঠল।

ভূতি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে প্রশ্ন করল, কী হয়েছে রে ? কীসের ভয় ?

কিম ভূতের সর্বাঙ্গ তখন ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। নীরবে পেটের দিকে আঙুল বাড়িয়ে একটা ছেঁদা দেখাল।

ছেঁদাটা নতুন। ইতিপূর্বে তার চোখে পড়েনি। রীতিমত অবাক হয়েই প্রশ্ন করল, কে করল ?

কিম ভূত কিছুক্ষণ আমতা আমতা করল। বললে, ছোট বাইরে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটা বাইসন তেড়েফুঁড়ে এসে পেটটা ছেঁদা করে দিয়ে চলে গেল। সেই অবধি পেট টিপে ধরে বসে আছি। এখন কী যে করব ঠিক করতে পাচ্ছিনা। পেট টিপে বসে থাকলেও বিপদ, আবার ছেড়ে দিলেও বিপদ। সব কিছুই বেরিয়ে পড়বে।

ভূতি চিক করে মুখে একটা শব্দ করল। তাড়াতাড়ি একটা বেলকাঁটা তুলে নিয়ে এসে এফোঁড় ওফোঁড় করে গর্তটা বুজিয়ে দিয়ে বললে, ভয় নেই। বেলের আঠা বুলিয়ে দিয়েছি। এবার জুড়ে যাবে।

কিম ভূতের মুখে খুশীর ঝিলিক খেলল। বললে, সত্যিই তো !

জুড়ে গেলেও কিম ভূতের ভয় কিন্তু ভাঙ্গল না। পাথরের মত নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল সে বেশ কিছুক্ষণ।

তার কাণ্ড দেখে ভূতি তাকে সাহস জোগাল। বললে, অত ভয় করিস নি। গাছ থেকে নেমে আয়। চল একটু বেড়িয়ে আসি।

ভূতি সাহস যোগাতে সে নেমে এল গাছ থেকে। তার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল।

বাঁশবন ঝাউবন কাশবন পেরিয়ে সবেমাত্র তালবনে পা দিয়েছে হঠাৎ এক উটকো দৈত্যি তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। কিম ভূতকে লক্ষ্য করে বললে, ওকে আমরা চাই।

তার মতলব যে ভালো নয় বুঝতে পারল কিম ভূত। কিন্তু নরম হলেই পাছে দৈত্যির সাহস আরও বেড়ে যায়, সে রীতিমত তেড়েফুঁড়েই বলল, ভাল

চাস তো শিগগীর সরে পড়। জানিস না তো আমি কে।

তোর মতো দৈত্যি আমি দু' আঙুলে নাচাতে পারি। তাছাড়া আমার বাসাতেও তোর মতো কটাকে পোষ্য রেখেছি।

সে কথাগুলো বেশ ঝাঁঝানো সুরে বললেও দৈত্যির মধ্যে তেমন কোনও ভীতি দেখা গেল না।

কথায় কাজ হল না দেখে কিম ভূত এবার অন্য পন্থা অবলম্বন করল। সে শিং নেড়ে গুঁতিয়ে দেবার ভয় দেখাতে লাগল তাকে।

দৈত্যি এতক্ষণ নীরব ছিল। সে খিঁক-খিঁক করে হেসে উঠল।

কিম ভূত বললে, কীরে হাসছিস যে বড়!

সে হাসি থামিয়ে বলল, মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিস। আসলে তুই নিজেই ভয় পেয়ে গিয়েছিস।

কিম ভূত বুক টান টান করে বললে, মোটেই না—

দৈত্যি আবার হেসে উঠল। একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখ—

কিম ভূত পিছন ফিরে তাকায়। লজ্জার একশেষ। তার লেজটি গুটিয়ে ছোট হয়ে গিয়েছে।

এতক্ষণে পরিষ্কার হল দৈত্যির হাসার কারণ। সে মনে মনে ভয় পেয়েছে ঠিকই কিন্তু তার যে এরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

কিন্তু সেটাতো মেনে নেওয়া যায় না। এইমুহূর্তে তাহলে ভূতিকেই হারাতে হবে।

হঠাৎ তার তিন নম্বর ফুলের কথা মনে পড়ে। সে ভাবল এই মুহূর্তে আমার লেজ আর শিং খসে মিলিয়ে যাক।

ব্যস্ ভাবার সাথে সাথেই কাজ হল। কিম ভূত তাল ঠুকে বললে, এবার—

দৈত্যি বার বার তার শিং আর লেজের দিকে তাকাচ্ছিল। মুহূর্তের মধ্যে তা মিলিয়ে যেতে দেখে সে উদ্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগল।

কিমভূত যেদিন আকণ্ঠ খেত, নিমগাছের মগডালে গা এলিয়ে ভূতিকে বলত, আজ আর কোনও কাজকম্ম নয়। খালি ঘুম। বারো ঘণ্টা হতে পারে, বাহাত্তর ঘণ্টাও হতে পারে। দেখিস কেউ যেন কাঁচা ঘুম না ভাঙ্গিয়ে দেয়।

ভূতির স্বভাবটা ছিল কিমভূতের বিপরীত। অর্থাৎ এই ধরনের মাত্রাতিরিক্ত খাওয়া তার একেবারেই পছন্দ ছিল না। তার ধারনা ছিল বেশী খেলেই মোটা হয়ে যাবে। মোটা হলেই ভুঁড়ি হবে। আর ভুড়ি হলেই কোনও ভূত তাকে পেত্নীর সম্মান দেবে না।

তাই খাদ্যের পরিমান সে কমিয়ে দিয়েছিল। এবং মাঝে মাঝেই উপোস করতেও শুরু করেছিল। কিন্তু তার ফল মোটেই ভাল হয়নি। ইদানীং সে বিশেষ ছোটাছুটি করতে পারছিল না। অল্প পরিশ্রম করলেই হাঁফিয়ে উঠত।

একবার এক দমকা ঝড়ে, নিমগাছের মগডাল থেকে উড়ে গিয়ে বাঁশ বাগানের লাগোয়া পুকুরে পড়েছিল। সে কি হৈ চৈ কাণ্ড। নিমতলায় রীতিমত জরুরী বৈঠক বসল। কীভাবে তাকে পুকুর থেকে তুলে আনা হবে। শেষ পর্যন্ত এক ফাঁপা মাটির কলসী জলে ভাসিয়ে, তুলে আনা হয়েছিল ঐ পুকুর থেকে।

এইভাবেই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের দিয়ে তাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।

একদিন যথারীতি কিমভূত বেরিয়েছিল দৈনন্দিন আহারের সন্ধানে। অন্যান্য দিন কাছাকাছি কিছু না কিছু একটা মিলে যায়। সেদিন আর তেমন কিছু মিলছিল না। চিন্তায় পড়ল কিমভূত। ডাহা উপোস করে রাত কাটাতে হবে। অগত্যা সে হাট বরাবর এগিয়ে চলল।

কিমভূত ফিরতে অনেক সময় দেরী করলেও, এত দেরী বড় একটা করেনা। রাত পুইয়ে কাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। সূর্য উঠে গেলে তো সকলেই যে যার বাসায় ঢুকে পড়বে। সারাটা দিন আর কোনও সাড়াশব্দ থাকবে না।

দুশ্চিন্তায় ভূতির কপালে ভাঁজ পড়ল। তাদের নিমগাছের কাছেই যে অশ্বত্থগাছটা আছে, তার মগডালের বাসীন্দা ঘেঁটু কিমভূতের প্রাণের বন্ধু। তার সুখ-দুঃখের কথা ঘেঁটুর কাছে না বলা পর্যন্ত সে শান্তি পায় না। ভূতি তাই দৌড়াল ঘেঁটুর সাথে দেখা করার জন্য। ঘেঁটু যদি কোনও আভাস দিতে পারে।

ঘেঁটু সব শুনে খিঁক-খিঁক করে হেসে উঠল। ভূতিকে উদ্দেশ্য করে বললে, তোরা যে সব মানুষের মত শুরু করলি দেখছি। মানুষ পাঁচ জায়গায়

যায়। তাদের ফিরতে দেরী হলে থানা পুলিশ করে। আমাদের আর কোন চুলো আছে পোড়ো বাড়ী আর শ্মশান ছাড়া।

ও তো ভয়নক পেটুক। তার ওপর আয়েসি। দেখগে কোথাও চব্যচষ্য খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘেঁটুর মন্তব্য শুনে কিন্তু ভূতি নিশ্চিন্ত হতে পারল না। সে বাসায় ফিরে এসে নিমডালে মাথা ঠুকতে লাগল। মাথা ঠুকতে ঠুকতে যখন মাথা প্রায় ফাটার পর্যায় পেঁাছেচে, হঠাৎ আশেপাশের গাছের মগডাল থেকে 'আসছে' 'আসছে' চীৎকার ভেসে আসতে লাগল।

প্রথমে সে এই শব্দটার গুরুত্ব ঠিক মত উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু ঘেঁটুর কণ্ঠস্বর কানে আসতেই সে সজাগ হয়ে উঠল।

কিমভূত ইতিমধ্যেই পেঁাছেছিল নিমগাছের পাদদেশে। ভূতি আড়চোখে তাকে দেখে, লুকিয়ে পড়ল পাতার ঝোপের মধ্যে। এমনভাবে ডালপালা দিয়ে সে নিজেকে আড়াল করল কিমভূত তাকে দেখতেই পেল না।

ভূতি পথ ঘাট বিশেষ চেনেই না। কিমভূত মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল ভূতি কোথায় যেতে পারে।

হঠাৎ তার পুঁটির কথা মনে পড়ল। পুঁটি ভূতির বন্ধু বটে। বড় বড় পা ফেলে সে পুঁটির বাসার দিকে এগুলো। যদি সে কোনও হদিস দিতে পারে।

পুঁটি গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে একটা আস্ত মোচা থেকে ফুল খুলে খাচ্ছিল। কিমভূত গিয়ে ভূতির খোঁজ করতেই, সে ইশারায় কিমভূতকে গাছের মগডালে আসতে বললে।

কিমভূত তর তর করে গাছে উঠে দাঁড়াতেই, পুঁটি ইশারায় দেখাল ভূতি কীভাবে গাছের মধ্যে আত্মগোপন করে বসে আছে।

ভূতির কাণ্ড দেখে কিমভূত মুচকি হেসে গাছ থেকে নেমে পড়ল।

তারপর ধীরে ধীরে এগুলো নিমগাছের দিকে। ভূতি কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই টের পায়নি। কিমভূত নিঃশব্দে গাছে উঠে, ভূতির মাথায় একটা টোকা মারতেই, সে ধরা পড়ে লজ্জায় নীল হয়ে গেল।

ভূতি যথাসময়ে গাছের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে কিম ভূত হাসতে হাসতে বললে, ব্যাপারটা কি ? দুঘণ্টা দেরী করেই নয় ফিরেছি। তাই বলে—

ভূতি রেগে টঙ হয়ে থাকলেও কিমভূতের কথা শুনে তার সমস্ত রাগ গলে জল হয়ে গেল। আতার বিচির মত সাদা দাঁতগুলো ঠোঁটের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে বললে—এই শেষবারের মত ক্ষমা করলাম।

আর কখনও যদি না জানিয়ে ফিরতে দেরী করিস, দেখবি কী হয়। তোর একদিন কি আমার একদিন। চিনিস তো আমাকে।

ভূতির এই ধরণের শাসানি নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে সে একাধিক

বার কিম ভূতকে এইভাবে শাসিয়েছে। তবে ভূতির রাগ দীর্ঘস্থায়ী নয়। সে ভালো করেই জানে।

তাই সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে কান মুনল। কাণ্ড দেখে ভূতি না হেসে পারল না। দাঁত দিয়ে নোখ কাটতে কাটতে বললে, হ্যাঁরা এতক্ষণ কোথায় ছিলিস বললি নাতো। কোথাও গিয়েছিলিস নাকি?

কিমভূত হাসল। কোথায় আবার। ভোজ খাচ্ছিলাম। তাইতো ফিরতে দেরী হয়ে গেল।

ভূতির চক্ষু ছানাবড়া। ভোজ খাচ্ছিলিস? সেকি রে—, কে তোকে নেমতন্ন করেছিল? কই আমাকে তো কিছু বলিস নি।

কিমভূত ফিক করে হেসে বললে, ধ্যুৎ কে আবার নেমতন্ন করবে। কার আর মাথার পোকা নড়েছে যে আমাকে নেমতন্ন খাওয়াবে।

ভূতির চোখে কৌতূহল। তবে যে বলছিস নেমতন্ন খেয়ে ফিরছিস—

কিমভূত ঘাড় নাড়লে। হ্যাঁ, বলেছি। কিন্তু ভোজ খেয়ে যে গলা শুকিয়ে কাঠ। পানা পুকুর থেকে আগে একঘটি ঠাণ্ডা জল নিয়ে আয়। খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিই।

ভূতি ঘটি হাতে করে তর-তর করে নেমে এল নিমগাছ থেকে।

দুর্ভাবনায় তারও গলাও শুকিয়ে গেছল। দু ঘটি জল সে একাই খেয়ে ফেলল। তারপর কিমভূতের জন্য একঘটি ঠাণ্ডা জল নিয়ে উঠে এল মগডালেতে।

কিমভূত চোখ বুজিয়ে বসে সদ্য তোলা একটা হিন্দী গানের সুর ভাঁজছিল। ভূতি তার মাথায় ঘটি থেকে খানিকটা জল ঢালতেই সে চোখ খুলল। ঘটিটা তার হাত থেকে নিয়ে ঢক করে জলটা খেয়ে ফেলল।

কিমভূত ঘটির জল নিঃশেষ করতেই ভূতি আবার তাকে চেপে ধরল ভোজ খাওয়ার গপ্পটা শোনার জন্য।

কিমভূত এবার আর কোনওরকম ভনিতা করল না। ভূতি চটলে আর রক্ষে নেই।

তাই সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে, শোন্ তাহলে বলি।

বাসা থেকে বেরিয়ে ভাবছিলাম শ্মশান তো মৃত মানুষে সরগরম। আজ ওখানে গিয়ে কোনও লাভ হবে না।

তার চাইতে হালুইপুরের কালু মাসীর বাড়ী যাই। অনেককাল খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি। কালু মাসীকে দেখাও হবে। খাওয়ারটাও সেখানে সেরে নেওয়া যাবে। এতদিন পরে যাচ্ছি বলে কথা!

তুই তো জানিস হালুইপুরের গঙ্গার ধারে এক পোড়ো বাড়ীর দোতলার অন্ধ কুটুরিতে কালু মাসী ছানাপোনা নিয়ে বাস করে।

মেসোর আবার ইঁটের ঘরে থাকা তেমন পছন্দ নয়। মেসো তাই ঘরের কার্নিশে যে অশ্বত্থ গাছটা ডালপালা মেলেছে তারমধ্যেই সে রাত্রিবাস করে। একমাত্র খাবারের প্রয়োজনেই সে ওই পোড়ো বাড়ীতে যায়।

মাসীর বাড়ীতে পেঁছে, ভেতরে ঢুকতেই বাধা। সে পোড়ো বাড়ী আর ভাঙ্গাচোরা নেই। ভেতরে গমগম করছে মানুষ। সাথে বিরাট পুজোর আয়োজন। চাল-কলা আর মণ্ডা-মেঠাই থরে থরে সাজানো। এই পোড়ো বাড়ীতে আবার পুজো করতে এল কে!

লুকিয়ে পড়লাম। আড়াল থেকে শুনলাম এই বাড়ীর মালিক গোঁসাই ঠাকুর সগ্গে গিয়েছে। তাই তার বাড়ীর লোকেরা ছেরাদ্দ করতে এসেছে এই বাড়ীতে।

শুধু তাই নয়। ঘরদোর সব সারিয়েছে রঙ করেছে। সেই অশ্বত্থ গাছটাও কেটে ফেলেছে।

মেসো মাসী কেউই নেই। মানুষের ভীড় দেখে তারা অন্য কোথাও সরে পড়েছে। ভাবছি বসে বসে কী করা যায়। ওদিকে খিদেতে পেট চুঁই-চুঁই করছে।

হঠাৎ দেখি পুজোর বাসন কোসন সব সরিয়ে ফেলে কলাপাতার পাত শুরু হয়ে গিয়েছে।

যারা এতক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল একে একে এসে বসে পড়ছে আসনে। তারপর—

কিমভূতের হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল। কষ বেয়ে একফোঁটা লাল ঝরে পড়ল মাটিতে।

ভূতি একটু বিরক্তই হল। বললে কী শুরু করলি বলত বুড়ো বয়সে।

কিমভূত একটু অপ্রস্তুতই হল। বললে, এরপর একে একে সব পরিবেশন-কারী আসতে লাগল আর ঝপাঝপ ফুলকো লুচি খাবার পাতার ওপর দিয়ে যেতে লাগল।

যেমন —, ভূতি গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

আরে, আমি কী আর সব নাম জানি। তবু যে নামগুলো কানে এল বলছি। লুচি, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা, ছ্যাঁচড়া, ছানার কালিয়া, ধোঁকার ডালনা, ফুলকপির তরকারী, বাধাকপির ঘন্ট, আলু বগরার চাটনি, পাঁপর ভাজা, দই, রসমালাই, লেঁডিকিনি, সন্দেশ, রাবড়ী……, আরও যেন কী ছিল। একবার কানে শুনে কি আর সব মনে রাখা যায়।

ভূতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল তারপর?

তারপর আর কি। এইসব চোখের সামনে দেখলে কী আর খিদের মুখে লোভ সামলে বসে থাকা যায়। একঘেয়ে মরা কুকুর বিড়ালের ঠ্যাঙ চিবুতে

চিবুতে তো জিবে ছ্যাত্‌লা পড়ে গিয়েছে।

তাক বুঝে যে ঘরে ওরা খাবার রেখেছিল সেই ঘরেই ঢুকে পড়লাম। তারপর আড়ালে বসে প্রাণভরে যেটা যত ইচ্ছে পেটে চালান করতে লাগলাম। কী পরিমান খেয়েছি এই পেট দেখলেই ঠাওর করতে পারবি বলে কিমভূত তার পেটে হাত বুলোতে লাগল।

ফল ভাল হল না। ভূতের মুখের ভেতর থেকে তিনটি বাদামী রঙের গোলাকার বস্তু বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে এসে ভূতির কপালে লাগল। এ ধরনের কোনও ঘটনার জন্য ভূতি একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

উঃ বলেই সে দুহাতে কপাল ধরে বসে পড়ল।

কিমভূত একটু অপ্রস্তুত হল। এটা নেহাৎই আকস্মিক ঘটনা। মুখ ফেরাতেই তার দুচক্ষু ছানাবড়া। ভোজ খাওয়ার পর শেষকালে যে পঁচানব্বইটা পান্তুয়া সে খেয়েছিল, তারই শেষ তিনটি আস্ত ছিটকে বেরিয়ে গেল। আর তারই আঘাতে ভূতি কপাল ফুলে ঢোল।

ভূতি কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, কী যে করিস তুই তার ঠিক নেই। আকণ্ঠ গিলেছিস। তাই সব হজম হয়নি। আস্ত বেরিয়ে গেল।

যাহোক্ যেটা কপালে লাগল এই খাবারটার নাম কি শুনি। নাম তোর মনে আছে ?

নাম! হ্যাঁ-হ্যাঁ এই তো বললাম। কী যেন—কী যেন। হ্যাঁ, মনে পড়েছে পানতোয়া। এরই ভাল নাম লেডিকেনি। ও যা খেতে! মুখে দিলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

ও তাই নাকি? ভূতি ওই লেডিকেনি তিনটে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল তারপর হাঁ করে টপাটপ খেয়ে ফেলল। দুচোখ তখন তার তৃপ্তিতে বুজে গিয়েছে।

গোঁসাইঠাকুর সগ্‌গে গেল। তাই তার ছেরাদ্ধ হল। আর তারজন্যই এই ভোজের আয়োজন!

ভূতির মাথায় কদিন ধরেই ঘুরছিল ব্যাপারটা। এরকম একটা ভোজের ব্যবস্থা তারাও তো করতে পারে। এমন কি আর কঠিন। শেষ পর্যন্ত সে মনের ইচ্ছেটা প্রকাশ করল কিমভূতের কাছে। বললে আমরাও তো এমন একটা অনুষ্ঠান করতে পারি।

মানুষেরা যা-যা করে আমরাও তাই করব। আর বনের সব ভূত পেতনিকে নেমতন্ন করে খাওয়াব। দেখবি কিরকম হৈচৈ পড়ে যায়। এখন শুধু তোর মতের অপেক্ষায়।

কিমভূত আড়চোখে তাকিয়ে ছিল ভূতির মুখের দিকে। এমন একটা বিদ্ঘুটে আবদারের জন্য সে একেবারেই তৈরী ছিল না।

ভূতির বলা শেষ হতে সে নীরবে বসে পাঁচমিনিট পা নাচাল। তারপর হিঁ হিঁ হিঁ করে হেসে উঠল। আচমকা এইরকম হাসাটা ভূতির একেবারেই পছন্দ নয়। দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল কিরে হাসলি যে বড়। কথাটা মনে ধরল না নাকি ?

কিমভূত হাসির দমক থামিয়ে বলল, ধ্যুৎ ভূতেরা কি মরে যে ছেরাদ্ধ করবি। আমরা তো মরেই ভূত হই। তবে আমারও ইচ্ছে করে এইরকম একটা কিছু করার। কিন্তু তা কি সম্ভব ?

তা বটে। তাহলে উপায় ?

দুজনেই নীরবে বসে রইল। এত তাড়াতাড়ি মতলবটা ভেস্তে যাক্ কারুরই ইচ্ছা নয়। বিশেষ করে ভূতির তো নয়ই।

হঠাৎ ভূতিই প্রথম চেঁচিয়ে ওঠে 'হয়েছে'—'হয়েছে' বলে।

কিমভূত ডালে পা ঝুলিয়ে বসে ঝিমুচ্ছিল। চমকে উঠে বললে, হলটা কী শুনি ?

ভূতি বললে, তুই বরং কদিন মরার ভান করে পড়ে থাক্। আমি রটিয়ে দিই এই প্রথম ভূত মরেছে। বাবা ভূতনাথের কৃপায় ভবিষ্যতে যাতে আর ভূত না মরে, সেজন্য মানুষদের মতোই তার ছেরাদ্ধ হবে। আর সেই ছেরাদ্ধ উপলক্ষ্যে সকলকে নেমতন্ন করে খাওয়ানো হবে।

কিমভূত দেখল মতলবটা মন্দ নয় তো। আর এতে ক্ষতিও কিছু নেই। হেসে বললে আমি রাজী। রটিয়ে দে আমি মরে গেছি।

খুশীতে ডগমগ ভূতির আর তর সয়না। তাড়াতাড়ি গাছ বেয়ে নেমে এল নীচেতে। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পিন্-পিন্ করে কাঁদতে শুরু করল। তাকে হঠাৎ ওই ভাবে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে ক্রমশ ভীড় জমতে লাগল সেখানে। দলে দলে ভূত পেত্নি ছুটে এল। তুঁতের বউ তুঁতুনি এগিয়ে গিয়ে তার এই শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করতে, ভূতি দুহাতে মুখ ঢেকে বললে, সর্বনাশ হয়েছে কিমভূত হঠাৎ মরে গিয়েছে।

মরে গিয়েছে ! সে আবার কি ? সকলেই অবাক চোখে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। হুঁকো ভূত পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করল হ্যাঁরা মানুষই মরে বলে শুনেছি। ভূত আবার মরে নাকি ? এই যে আমার তিনশো বছর বয়েস হয়েছে। আমি কি মরেছি ? আমার দাদুর বয়েস তো তিন হাজার বছর। কই সে তো মরেনি ! হুঁকোর কথা শুনে ভূতি পিনপিনানি আরও বেড়ে গেল। বললে, তাইতো জানতাম। কিন্তু কিমভূতের তো কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাত পাও নড়ছে না। মানুষ মরলে তো ওইরকমই হয় বলেই শুনেছি।

'ও তাই নাকি!' এবার সকলে মিলে ভূতির সাথে কান্নায় যোগ দিল।

ক্রমশ প্রতিবেশী ভূত পেত্নিতে ছেয়ে গেল নিমতলা। সকলেই এই আশ্চর্য ঘটনা স্বচক্ষে দেখতে এসেছে। এদের মধ্যেই অনেকে কিমভূতের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাচ্ছে। কিমভূত এখন আর ভূত নয়, দে-ব-তা হয়ে গিয়েছে!

এদিকে মুস্কিলে পড়েছে কিমভূত। সারা দিনরাতই সে ছটফটিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

একেবারে না নড়ে চড়ে বা কথা না বলে নিঃশব্দে শুয়ে থাকা কি মুখের কথা। অনেক ধের্য থাকা দরকার। এত ধৈর্য তার নেই।

যাহোক শেষ পর্যন্ত সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। সকলেই শোকে কপাল চাবড়াতে চাবড়াতে বাসায় ফিরে গেল।

ভূতি এটাই চাইছিল। কিমভূতের কাছে গিয়ে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, পরীক্ষায় তো পাশ করে গিয়েছিস। নে উঠে পড়। তবে কদিন গাছ থেকে একেবারেই নামিস নি। যেরকম হৈচৈ দেখছি সারা পৃথিবীর ভূতেরা হাজির হলেও অবাক হব না, যাহোক আমি এখন ছেরাদ্ধের যোগাড়ে বেরোই। দেখি, কতটা কি করতে পারি। এত রকম খাবারের রসদ যোগাড় করা কি মুখের কথা। মানুষ হলে না হয় একটা কথা ছিল। আমরা তো গেছো ভূত!

ভূতি তো বড় একটা পথে বেরোয় না। যে জন্য লখিমপুরের বেশীর ভাগ পথঘাটই তার অচেনা।

কোথায় কি পাওয়া যায় মোটামুটি খোঁজখবর নিয়ে যখন সে ফিরল রীতিমত ক্লান্ত। কিন্তু ফিরেই সে নিমতলায় যে দৃশ্য দেখল তার চক্ষু ছানাবড়া!

তার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। বিশ্বের প্রায় কয়েক লাখ ভূত পেত্নি খবর পেয়ে ছুটে এসেছে মরা ভূত দেখতে। হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে তাদের মধ্যে কিম ভূতকে স্পর্শ করার জন্য।

কিন্তু এত ভূত পেত্নির একসাথে নিমগাছে ওঠা সম্ভব নয়। সে কারনে নানা ফন্দী ফিকিরের আশ্রয় নিতে শুরু করেছে তারা।

লম্বা ভূত পেত্নিরা যদিও বা গলা বাড়িয়ে কিম ভূতকে দেখতে পাচ্ছে, মুস্কিলে পড়েছে বেঁটেরা। কিন্তু কেউই দর্শন না করে ফিরে যেতে চায় না।

একটি বামন ভূত মরিয়া হয়ে একজন লিকলিকে লম্বা বিদেশী ভূতের ঘাড়ে চড়ে কিমভূতকে দর্শন করতে গিয়ে এক বিপত্তি ঘটাল।

সে যখন প্রায় কিম ভূতের নাগালের মধ্যে পৌঁছিয়েছে, হঠাৎ 'মট্' করে ওই বিদেশী ভূতটির ঘাড় মটকে গেল।

ব্যাস্, আর যায় কোথা। সকলে একসাথে ওই বেঁটে ভূতকে ঘিরে ধরল। বললে ঘাড় সোজা না করে দিলে ছাড়া হবে না। বিদেশে এখবর পৌঁছলে সেখানকার ভূতেরা কী মনে করবে।

ইতিমধ্যে বেঁটে ভূতের সমর্থকেরা এসে জড় হল সেখানে। তারা বলল, এটা নেহাৎই দুর্ঘটনা।

বেধে গেল লড়াই। দেশী বনাম বিদেশী ভূতেদের মধ্যে।

প্রথমে হাতাহাতি। হৈ হৈ কাণ্ড। কারুর হাত ভাঙ্গল কারুর পা মচকাল, কারুর হাঁটুর জোড় খুলে গেল। কিম ভূত গাছের মগডাল থেকে আড়চোখে সব কিছুই দেখছিল।

গণ্ডগোল তো কমলই না। বরং বেড়ে গেল।

শুরু হল ছোঁড়াছুড়ি। শ্মশানের পোড়া কাঠ থেকে শুরু করে ইঁট ও পাথরের টুকরো বৃষ্টির মত ঝরতে লাগল নিমতলাতে।

গণ্ডগোল বাড়তে কিম ভূত ভয়ে কাঁপছিল। ভূতি পাশ থেকে পেটে খোঁচা মেরে বলছে কাঁপিসনি। ভূতেরা দেখতে পেয়ে যাবে। মরা মানুষ নড়ে না!

বলতে বলতেই একটা পাথরের টুকরো এসে কিম ভূতের পেটের ওপর পড়ল।

আঘাত লাগা মাত্রই কিম ভূত 'অঁক্' করে একটা শব্দ করল মুখে।

ভূতি জিব কেটে আবার তার পেটে একটা খোঁচা মেরে বললে, শুরু করেছিস কি। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে তবে ছাড়বি দেখছি।

যদি কেউ এই শব্দ শুনতে পায়, তাহলে আমাদের কী হাল হবে বলত। নেহাৎ বাবা ভূতেশ্বরের দয়া তাই এই মুহূর্তে পাশে কেউ নেই। থাকলে—

কিম ভূত ফিস ফিস করে বললে, সবই তো বুঝলাম কিন্তু কথা না বলে আর কতক্ষণ থাকব। দেখছিস আমার পেটের কী হাল। ভেতরে জমা কথা গিজগিজ করছে। এখন পেট ফেটে কথা না বেরিয়ে পড়ে।

'আহা' বলে যখন ভূতি তাকে সমর্থন জানাতে যাচ্ছে—ঠিক সেই মুহূর্তে আবার একটা অঘটন ঘটল। একটা রোগা আর একটা মোটা ভূত ধস্তাধস্তি করতে করতে তাদের কাছে পৌঁছানোর মুহূর্তেই, রোগা ভূতের এক লাথিতে মোটা ভূতটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিম ভূতের পেটের ওপর।

তার কানটা সরাসরি কিম ভূতের পেট স্পর্শ করতেই সে চমকে উঠল। পেটের মধ্যে রকমারি কথাবার্তা কল্‌কল্ করছে।

লাথির ব্যথা সে মুহূর্তে ভুলে গেল। এ কী কাণ্ড! মৃতের পেটে কথা! সে টেরা চোখে ভূতির দিকে তাকাল। বললে মরে গেলে আবার পেটে কথা কলকল করে নাকি?

ভূতি দেখল আর রক্ষা নেই। একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু এ কথা বাকি ভূতেরা জেনে গেলে তারা কিমভূতের পিটের ছাল তুলে

নেবে।

এদিকে সেই মোটা ভূতটা ভূতির মুখ থেকে উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ভূতি হারবে না। চট করে একটা উত্তর ভেবে ফেলল। গলার স্বরটা একটু ভারী করে বললে, কিম ভূত যখন জীবিত ছিল এই কথাগুলো ওর পেটের মধ্যেই জমে ছিল। বলার সুযোগ পায়নি। হঠাৎ মরে গিয়েছে তাই কথাগুলো বেরুতে না পেরে কল্‌কল্‌ করছে। এই আর কি।

সে ভূতির মুখের দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কথাও তাহলে পেটে জমে থাকে। কী সব বিদঘুটে ব্যাপার। নিজের মনে বিড়বিড় করে বকতে বকতে সে নেমে গেল গাছ থেকে।

দর্শনার্থীদের চাপ সামলাতে শেষ পর্যন্ত তাদের সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করানো হল। তারা একে একে নিমগাছে উঠে এসে কিম ভূতকে শেষ দর্শন করে যেতে লাগল।

কেউ তার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় স্পর্শ করল, কেউ মাথা নত করে কিম ভূতের পায়ে ঠেকাল, কেউ তার গা স্পর্শ করল, কেউ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, কেউ আবার তার হাত তুলে নিয়ে করমর্দন করল। এমনই অনেক কিছু ঘটতে লাগল সেখানে।

খালি হাতে কেউই আসেনি। সকলেরই হাতে কিছু না কিছু উপহার ছিল। তার মধ্যে রকমারি ফুলের সংখ্যাই বেশী।

ফুলের গন্ধ নাকে যেতে কিম ভূত আড় চোখে তা দেখার চেষ্টা করছিল বটে কিন্তু ভূতির চোখ রাঙানির ভয়ে সে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলছিল।

এক বিলেতী ভূত কেক এনেছিল বিলেত থেকে কিমভূতকে খাওয়ানোর জন্য। সেটা হাত বাড়িয়ে দিতেই কিম ভূতও প্রায় হাত বাড়িয়ে ছিল। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে যেতে সে যাত্রাও বেঁচে গেল।

প্রায় তিনদিন ধরে চলল এই মৃত দর্শন পর্ব।

এই মুহূর্তে ভূতি অসহায়। তার কিছুই করার নেই। সে যদি এখন ঘোষণা করে কিম ভূত মরেনি, বেঁচে আছে তাহলেও বোধহয় সে নিস্তার পাবে না।

কিম ভূতকে ছেড়ে তাকেই উত্তম মধ্যম লাগাবে সকলে। এমন কি তাকে বন ছাড়া করলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

এখন ভূতির একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যে ব্যাপারটা কতদূর সফল হবে কে জানে।

দর্শনার্থীদের ভীড় পাতলা হতে কিমভূত ভূতিকে একলা পেয়ে বললে,

কী কাণ্ডটা করলি বলত ? কথা না বলে আর কতদিন চেপে থাকব। সব কিছুরই একটা সীমা আছে তো ?

পেটে জমা কথার চাপে পেট তো এই ফাটল বলে।

তাছাড়া চোখও আর বন্ধ করে রাখতেও পাচ্ছি না। আর কিছু দিন বন্ধ রাখলে শেষপর্যন্ত চোখ আর খুলবে কী না সন্দেহ।

তিনদিন কাটল।

শুধু কিমভূতই নয় ভূতিও হাঁপিয়ে উঠেছিল। দেশী বিদেশী মিলিয়ে প্রায় দেড় লাখের মত ভূত পেতনি দর্শন করতে এসেছিল তাকে। ব্যাপারটা এখনও ফাঁস হয়ে যায়নি এই যা রক্ষে।

এবার ভূতভোজনের আয়োজনের পালা। যে জন্য এত সব কাণ্ড।

ভূতি সেদিন চক্কর দিয়ে এসেই বুঝেছিল জিনিষপত্তর যোগাড় করা এত সহজ নয়। তাছাড়া একজন বামুনও দরকার।

কিমভূতকে সেই অসুবিধার কথা বলতেই সে বললে, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। মানুষ কখনো এই ভূতের আড্ডায় আসে। ধরে বেঁধে না আনলে কেউই আসবে না। মুখে যাই বলুক।

তারাতো ভূতকে ভয়ই করে !

ভূতি ভ্রূ কুঁচকে বললে তাহলে—

কিমভূত বললে, দাঁড়া মাথা চেলে দেখি।

ভূতি খুঁজে খুঁজে এক বামুন পাড়ায় ঢুকে, ঘুর ঘুর করতে লাগল।

এখানে সারি সারি ঘরে হালুইকর বামুনের বাস। ঘরের সামনে অনেকেরই নাম লেখা বোর্ড রয়েছে।

ভূতি তো পড়তে পারে না। ঘরে ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারছে।

দুটো লোক দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। একজন বলল নটবরকে দিয়ে কাজ করানোই ভাল। ওর রান্নার হাত ভাল। তাছাড়া ও চুক্তিতেও কাজ করে।

ভূতি শুনে ভাবল তা মন্দ কি। এই নটবরকে ধরলেই তো হয়। পরিচয় যখন পেয়ে গিয়েছি ছাড়ি কেন।

ভূতি ওদের অনুসরণ করে নটবরের ঘরটা চিনে নিল।

হালুইকর বামুন নটবরের বয়স এই পঞ্চাশের মত।

এখন সে আর নিজের হাতে রাঁধে না। সহকারীদের দিয়ে রাঁধায়।

নটবর রাতের আহার সেরে পান খাচ্ছিল।

ভূতি বুঝল এই সুযোগ। হঠাৎই তার ঘাড়ে চড়ে বসল।

নটবর প্রথমে ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। ভাবল ঘাড়ে ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে সে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু এতো সে রোগ নয়। ক্রমশ সে বিড় বিড় করে বকতে শুরু করল। অনেক ডাক্তার বদ্যি হার মানল। শেষ পর্যন্ত ডাক পড়ল ওঝা।

ওঝা সব লক্ষণ দেখে বললে অপদেবতায় ভর করেছে কোনই সন্দেহ নেই। এখন তাকে তুষ্ট করতে হবে। তবে যদি রেহাই মেলে।

ওঝা বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে একমুঠো সরষে নটবরের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই একটা অস্পষ্ট সুর ভেসে এল—ডাকছিস কেন কিছু বলতে চাস?

হ্যাঁ। ওঝা কপালে হাত ছুঁইয়ে বলল, নটবর গরীব মানুষ। খেটে খায়। ওর কাঁধে শুধু শুধু ভর করলি কেন? কী করলে মুক্তি দিবি?

ভর করেছি প্রয়োজনে। একটা কাজ করে দিতে হবে ওকে। ও যদি রাজী হয় এখুনি মুক্তি দেব।

ওঝা নটবরের সঙ্গে ভূতের সর্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে সে নিঃসঙ্কোচে জানিয়ে দিল মুক্তি সর্তে যে কোনও কাজে প্রস্তুত।

ওঝা সে কথা জানিয়ে দিতেই ভূতি বললে আগামীকাল অমাবস্যা। মধ্যরাতে নটবর যেন একবার শ্মশানের ধারে নিমতলায় যায়। ভয়ের কিছু নেই। কী করতে হবে বলে দেব।

এ খবর যেন আর কেউ না জানতে পারে।

ওঝা বলল, তথাস্তু।

নটবর সুস্থ হল এবং কথাও রাখল। অমাবস্যা রাত গভীরে সে সোজা গিয়ে হাজির হল নিমতলায়। ভূত পেতনিরা তখন যে যার বাসায় ঢুকে পড়েছে।

কিমভূতই কথা বলল। বললে আমার ছেরাদ্ধ। লাখ খানেক ভূত পেতনি নেমন্তন্ন খাবে। রেঁধে দিতে হবে তোকে।

শুধু তাই নয় জিনিষপত্তরও তোকেই আনতে হবে। আমাদের পয়সাও নেই ক্ষমতাও নেই। তাই দেওয়ারও কোনও প্রশ্ন নেই।

যদি এই প্রস্তাবে রাজী হোস তো ভাল কথা। না হলে আবার কাঁধ ভারী হবে এই আর কি।

নটবর একমুহূর্তও সময় নষ্ট করেনি উত্তর দিতে। করজোড়ে বললে মেনুটা কী হবে জানতে পারি কি?

নিশ্চই-নিশ্চই। তবে ওটা আমি বলব না। ভূতিই বলবে। ভূতি এতক্ষণ শ্রোতা ছিল।

এবার ভূতির গলা স্পষ্ট হয়ে উঠল। বললেন মানুষের ছেরাদ্ধে যা যা হয়, তাই হবে। যেমন সাদা ময়দার ঘিয়ে ভাজা লুচি, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা, ছানার ডালনা, ধোঁকার তরকারী, ফুলকপির ডালনা, চাটনি, পাঁপড় ভাজা, দই, রসগোল্লা, পানতোয়া, সন্দেশ, রসমালাই···, এই আর কি।

নটবর ঘাড় নেড়ে বললে বুঝেছি। আর বলতে হবে না।

আবার ভূতি সরব হল। শোন রান্না কিন্তু সেরা হওয়া চাই। যদি মন দিয়ে না রাঁধিস বুঝতেই পারছিস শাস্তি কি।

নটবর ঘাড় নেড়ে বললে, কোনও চিন্তা নেই। আমার জীবনের সেরা রান্নাই রাঁধব, এবং পরিবেশন করে দিয়ে যাব। শুধু দয়া করে ঘাড়ে চেপো না।

ভূতি মুচকি হেসে বললে দেখা যাক।

ভূতি ইতিমধ্যেই মুখে মুখে নেমন্তন্নটা সেরে রেখেছে। এ নিয়ে আর তাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে না। এদিকে নটবরও গাড়ীবোঝাই করে জিনিষপত্তর নিয়ে হাজির নিমতলাতে।

ভূত পেত্নিরা এই সব দেখেশুনে আশেপাশে ভীড় জমাতে শুরু করেছে।

নটবর চটপট সবকিছু গুছিয়ে নিল। উনুন গনগনিয়ে উঠল আগুনে। নটবর কড়ায় ফুটন্ত জলে ডাল ছেড়ে রান্না শুরু করল।

ডাল ফুটছে। ফুটন্ত জলে ডালের নাচ ভূতপেত্নিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আশে পাশে যারা ছিল সকলে দল বেঁধে এগিয়ে এল নাচ দেখার জন্য।

নটবর কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না বটে কিন্তু চারপাশে যে একটা ভীড় জমেছে সেটা সে বুঝতেই পারছিল।

নটবরের মুখে কথা নেই। সব কাজ একা করা নেহাৎই মুখের কথা নয়। তার ওপর ত্রুটি থাকলেই বিপদ।

এদিকে ভূত পেত্নিরা সেখান থেকে ভূতির তাড়া খেয়ে আশেপাশের গাছে উঠে পড়েছে। সেখান থেকেই তারা নানারকম কুস্বর করে চীৎকার করছে।

নটবরের পাকা রাঁধুনে। তার ওপর প্রাণপাতের আতঙ্ক। এক সেকেন্ডও ফুরসৎ নিতে চায় না সে।

একটা করে পদ চড়ায় আর নামায়। দেখতে দেখতে তার বাইশ রকম পদ রান্না শেষ।

সবশেষে মিষ্টি তৈরীর পালা। ছানা এসেছে একমন।

বকের সাদা পালকের মত সাদা ছানা। খাঁটি মুলতানি গরুর দুধ থেকে তৈরী।

রসগোল্লা পানতোয়া আর সন্দেশ এই ছানা থেকেই তৈরী হবে। রসগোল্লা নামটা ভূতপেত্নিদের কাছে খুবই পরিচিত।

শ্মশানে যারা আসে ফিরে যাবার সময় সকলে মিষ্টি মুখ করে। আর তখনি ভাঁড় ভাঁড় রসগোল্লা আসে দোকান থেকে।

ভূতেরা তা গাছে বসে দেখে। মানুষে টপাটপ মুখে ফেলে আর ভূত পেত্নিরা জিব দিয়ে ঠোঁট চাটে।

সেই থেকেই তাদের রসগোল্লায় লোভ। আর সেই রসগোল্লা এখুনি তৈরী হতে চলেছে তাদের জন্যে।

রসগোল্লার নাম শুনে বুড়ো বাচ্চা কেউ আর লোভ সামলাতে পাচ্ছে না। তবে পাকে দেরী হওয়াটা কারুরই আর ভালো লাগছে না।

এদিকে নটবর যথারীতি ছানা ছেঁচে জল বার করে, গোল্লা পাকাতে বসল। ভূত পেত্নিরা আড়াল থেকে তার সংখ্যা গোনার চেষ্টা করে। কে কটা রসগোল্লা ভাগে পাবে সেটা জানাই উদ্দেশ্য।

একটা ভূত বললে রসগোল্লা খাওয়া এই প্রথম, এই শেষ। কমপক্ষে পাঁচ ডজন আমি তো খাবই। আর একজন বললে তুই যদি পাঁচ ডজন খাস আমি দশ।

একটা পেত্নি পাশ থেকে বললে আমি তাহলে এক হাঁড়ি তো বটেই।

পেত্নির এই বাড়াবাড়িটা কারুরই ভালো লাগল না। একজনের আবার শুনে এতই মাথা গরম হয়ে গেল সে আর রাগ সামলাতে পারল না। ঠাস করে পেত্নিটার গালে একটা চড় কষিয়ে বললে, পেটুকেপনা করিস নি। তোর নিজের ছেরাদ্ধ হবে যখন হাঁড়ি হাঁড়ি রসগোল্লা খাস।

পেত্নিটা একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল।

প্যাংলা একটা আমড়া গাছের ডালে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল রসগোল্লার কড়ার দিকে। নটবর মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দেখছে সেগুলো ঠিকমত রস ঢুকেছে কী না।

দেখতে দেখতে প্যাংলার জিব সরসরিয়ে উঠল। সাথে সাথে একফোঁটা লাল ঝরে পড়ল মাটিতে। প্যাংলা আড়চোখে চারপাশে তাকাল। না, কেউ দেখতে পায়নি!

ইতিমধ্যে নটবর রসগোল্লা গামলায় তুলতে শুরু করেছে।

প্যাংলা আর লোভ সামলাতে পারল না।

গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রসগোল্লার গামলা বরাবর। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। নটবরের চোখে ধোকা দিয়ে কটা রসগোল্লা সরানো।

নটবর সজাগই ছিল। হঠাৎ গামলা থেকে গোটাকয়েক রসগোল্লা শূন্যে উঠতে দেখে খপ করে ধরে ফেলল।

প্যাংলা কিন্তু এজন্য বিরক্তই হল।

নটবর এভাবে তাকে বঞ্চিত করবে সে ভাবতেই পারেনি। ক্রুদ্ধ হয়ে সে নটবরের পিঠে খিমচে দিল।

নটবর বুঝল কাজটা ঠিক হয়নি। পরিণামে অশান্তি ঘটতে পারে সে ধরে নিয়েই চারটে রসগোল্লা তুলল রস থেকে। তারপর সেটা মেলে ধরল শূন্যে।

নিমেষেই রসগোল্লা অন্তর্ধান। প্যাংলা খুব খুশি। চারটে রসগোল্লা একসাথে পুরে দিল মুখেতে। দারুণ! কিন্তু—। গরম রসে ছ্যাঁকা লাগতে লাগল পেটের ভেতর।

প্যাংলা চীৎকার করতে গিয়েও সংযত হল। কারণ আর কিছুই নয়,

ঘটনাটা জানাজানি হলে কেউই তাকে সহানুভূতি দেখাবে না। কিন্তু পেটের ভেতর ছ্যাঁকা লাগার দপদপানি ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

সে লাফাল ঝাঁপাল ডিগবাজী খেল। কিন্তু তাতেও যখন কমল না, সে পানাপুকুরের পচা জলে ডুব মেরে বসে রইল।

রসগোল্লা তৈরী দেখার হুজুক যথাসময়ে মিটল। ভূত পেত্নিরাও ক্রমশ স্থির হয়ে বসল। এবার পানতোয়া তৈরীর প্রস্তুতি। নটবর ঘিয়ের কড়া চড়াল।

আবার হৈচৈ পড়ে গেল ভূতপেত্নিদের মধ্যে। ভূতেরা পানতোয়া-পানতোয়া বলে উচ্চৈস্বরে হৈ হট্টগোল বাঁধালেও পেত্নিরা অবশ্য লেঁডিকিনিই বলছিল। এই নামটাই তাদের মনে ধরেছে বেশী।

ছেঁচাকি পেত্নিদের মধ্যে অধিক হাসিখুশী।

সে বললে, লেঁডিকিনি বোধহয় আমাদের জন্যেই তৈরী হচ্ছে। এর গায়ের রঙ হুবহু আমাদের মতই।

ছেঁচাকির কথা শুনে পেত্নিরা খিল-খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

রান্না পর্ব যথাসময়েই শেষ হল। নটবরও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এবার লুচি ভাজার পালা। লুচি কেমন করে ফোলে এখন সেটা দেখাই তাদের উদ্দেশ্য।

লুচি ভাজা হচ্ছে বাতাসে খবরটা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে গেল রাজ্যের ভূত পেত্নিদের মধ্যে।

ব্যাস আর যায় কোথা। স্রোতের মত ভূত পেত্নি আসতে লাগল চারদিক থেকে। লুচি তারা কখনো চোখে দেখেনি নাম শুনেছে। তাই একবার স্বচক্ষে লুচি দর্শন করতে চায় সকলে।

তবে লুচি শব্দটা কারুরই মুখ ফুটে বেরুচ্ছে না। নুঁচিই বলছে তারা।

ভূতি গাছের মগডালে বসে সবকিছুই লক্ষ্য করছিল। সে যে ভূত ভোজনের স্বপ্ন দেখেছিল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তা সত্য হতে চলেছে।

তারা চিরকাল মানুষকেই ভোজ খেতে দেখে এসেছে। তারাও যে ভোজ খেতে পারে সেটাই আজ দেখিয়ে দেবে মানুষকে। এবং এজন্য যা কিছু কৃতিত্ব সব তাদেরই।

ওদিকে এক বস্তা ময়দা ঢালা হয়েছে মাঠের ওপরে।

দূর থেকে একটা ছোটখাটো ময়দার পাহাড় ভ্রম হচ্ছে। তার ওপর এক বালতি জল ঢেলে ময়দা মাখা শুরু করল নটবর।

এই পর্বত পরিমাণ ময়দা মেখে জব্দ করা কি মুখের কথা। অথচ সব

দায়িত্বই তার। না করলে উপস্থিত ভূত পেত্নিরা সবাই মিলে তার ঘাড় মটকাবে।

ময়দার তালটা হল প্রায় একটা কামানের গোলারই মত। সেটাকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিশ হাজার লেচি পাকানো হল। লুচি ভাজা শুরু হবে এখুনিই।

ঘিয়ের কড়া উনুনে বসাতেই কল্‌কল্‌ শব্দ করে ঘি গলতে শুরু করল।

লুচি ভাজাটা স্বচক্ষে দেখতে চায় ভূত পেত্নিরা। তাই যে যেখানে পেরেছে উঠে পড়েছে। চত্বরে শ' পাঁচেক গাছের একটি ডালও খালি নেই।

কুচো বাচ্চা নিয়ে সকলেই এক একটা গাছ দখল করেছে। যাতে লুচি ভাজাটা দেখতে কোন অসুবিধা না হয়। কিন্তু সকলেই রোগা পটকা নয়। মোটা সোঁটাও ছিল অনেক। তাদের ভার গাছে সইতে পারবে কেন।

মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ল একটা তাল গাছ। আর তার যা পরিণতি সবই ঘটল। তিন ভূত আর এক পেত্নি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কারুর হাত ভাঙ্গল কারুর পা ভাঙ্গল। কারুর বা মচকে গেউ ঘাড়টা।

এই দুর্ঘটনা দেখে অনেকেই ভয়ে নেমে পড়ল গাছ থেকে। তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়েও অনেকেরই মাথা ফাটল।

হঠাৎই 'ছেড়েছে' 'ছেড়েছে' বলে রব উঠল চারদিক থেকে।

যারা গাছের মগডালে বসেছিল তারাই চীৎকার জুড়েছিল। জীবনে তারা লুচি দেখেনি। স্বভাবতই তারা আনন্দে উল্লসিত।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। এদিকে লুচি একের পর এক ঘিয়ে ছেড়ে চলেছে নটবর।

হঠাৎ আবার চীৎকার উঠল 'ডুবেছে' 'ডুবেছে'। অর্থাৎ কাঁচা লুচিগুলো একে একে তলিয়ে যাচ্ছে ফুটন্ত ঘিয়ের ভেতরে। যারা সরাসরি দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছিল না তারা মগডালের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। হঠাৎ তাদের মুখে ডুবেছে শুনে কিন্তু ভূত পেত্নিদের চোখে মুখে চিন্তার ছাপ দেখা দিল।

এত আশা নিয়ে বসে আছে সকলে নুঁচি খাবে বলে। আর শেষকালে কিনা নুঁচি ডুবতে বসেছে।

অনেকে হাত দিয়ে মাথা চাপড়াতে লাগল। হায়-হায় এমন রাজকীয় ভোজটা বোধহয় মাঠে মারা গেল। কিন্তু এ দুঃখ বেশীক্ষণ রইল না। আবার 'ভেসেছে' 'ভেসেছে' চীৎকারে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল। আবার খুশীর জোয়ার এল ভূত পেত্নিদের মধ্যে।

ঘিয়ের ওপর একগুচ্ছ ফোটা সাদা পদ্ম যেন ভাসছে!

নটবর ছেঁকে ছেঁকে তুলছে আর থাকে থাকে সাজিয়ে রাখছে। তা থেকে ভুর ভুর করে বেরুচ্ছে গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ। কিছু চ্যাংড়া লুকিয়ে হাত দুচারখানা টানার চেষ্টা করল কিন্তু ধরা পড়ে গেল নটবরের চোখে।

তবে নটবরের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ধোঁকা টোকা টুকটাক এদিক ওদিক পাচার হয়ে যেতে শুরু করল।

লুচি ভাজা শেষ হতে নটবর কপালের ঘাম মুছল। গত পঞ্চাশ বছরেও সে এত লুচি একসাথে ভাজেনি। কিন্তু সে কথা বলেই বা লাভ কি।

স্রেফ প্রাণে বাঁচার জন্যেই এই অমানুষিক পরিশ্রম তাকে করতে হল!

নটবরের রান্না শেষ হতেই ভূতি তালগাছের মাথায় উঠে চীৎকার করে বলল তোমরা শুনে খুশী হবে খাবার প্রস্তুত। এখুনি কিমভূতের ছেরাদ্ধ উপলক্ষ্যে ভূত ভোজন শুরু হবে। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লেখা থাকবে। এখন সকলে তালপাতা পেতে, লাইন দিয়ে বসে পড়। আগে এলে আগে খেতে পাবে।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের গাছ থেকে কুলকুল করে নামতে লাগল ভূত পেতনিরা। এত ভূত পেতনি গাছের ঝোপ ঝাড়ে নেমন্তন্ন খাবে বলে বসে আছে, খোলা চোখে ধরা পড়েনি।

যত তালপাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল, মুহূর্তের মধ্যে সাফ হয়ে গেল। সকলে তালপাতার সন্ধানে এ বাগান সে বাগান ছোটাছুটি শুরু করল।

তালপাতার লোভে, তারা মটমট করে ভেঙ্গে ফেলল কটা তালগাছ। কিন্তু তাতেও অভাব মিটল না।

শেষপর্যন্ত যে যা পেল তাই পেতেই বসে পড়ল পংক্তিতে।

ক্রমশ নুঁচি নুঁচি চীৎকারে মুখরিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। কারুর আর তর সইছে না।

নটবর বেরুল লুচির ঝুড়ি নিয়ে। কাউকেই সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু চারদিকে সাড়া শুনতে পাচ্ছে।

পাতে লুচি দিতে না দিতেই অদৃশ্য। শুধু লুচি চিবানোর শব্দ ভেসে আসছে চারপাশ থেকে।

নটবর দেখল মহামুস্কিল। লুচির ঝুড়ি রেখে সে তরকারী আনতে গেল। কিন্তু ফিরে আসতেই তার চক্ষু চড়কগাছ।

লুচি বোঝাই ঝুড়ি হাওয়া। অনেক খোঁজা খুঁজির পর খালি ঝুড়িটা ইঁটের ভাটা থেকে মিলল।

নটবর আবার লুচি নিয়ে এল। সকলেই নুঁচি নুঁচি বলে চীৎকার জুড়েছে। খাচ্ছে না লুকিয়ে ফেলছে কে জানে।

নুঁচি নুঁচি রব উঠতে নটবর দেখল পাতে দেওয়া আর সম্ভব নয়। সে একগোছা লুচি ছুঁড়ে দিল। সাথে সাঁথে শুরু হয়ে গেল লুচি নিয়ে কাড়াকাড়ি। কাড়াকাড়ি থেকে ক্রমশ মারামারি!

যে যতগুলো পারল লুচি সরিয়ে ফেলল। যারা পেলনা তারা আক্রোশে

ফুলতে লাগল।

ভূতি অবশ্য ভূতেদের এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দিল না। সে সকলকেই আবার শান্ত করে বসাল এবং প্রত্যেককেই অপেক্ষা করতে বলল।

সকলে শান্ত হতে আবার পরিবেশন শুরু হল। এবার আর লুচি নয়। তরকারী আর দই মিষ্টি।

এক একটা করে পদ আসে আর হৈচৈ পড়ে যায়। অল্পে কেউই খুশী নয়। আরো দে আরো দে চীৎকারে মুখরিত হয়ে ওঠে চারদিক।

ধোঁকা তাদের খুবই ভালো লেগেছে। এক একজন দশবিশটা করে ধোঁকাও ইতিমধ্যেই উদরস্থ করেছে।

যারা সুমুখে বসেছিল তারাই সুযোগ পাচ্ছিল বেশী। পেছনে যারা ছিল তারা আর ধৈর্য ধরতে পারল না। তালপাতা মাথায় তুলে নিয়ে ছুটে আসতে লাগল সেদিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মারামারি কিলোকিলি আর চুলোচুলি শুরু হয়ে গেল ভূত পেত্নিদের মধ্যে।

দুষ্ট প্রকৃতির কিছু ভূত পেত্নি এরই অপেক্ষায় ছিল। তারা গায়ের জোরে লুটপাট শুরু করে দিল।

ভূতেদের কাণ্ডকারখানা দেখে ভীত নটবর উর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানের দিকে দৌড়তে শুরু করল।

ভূতি দেখল যেভাবে কয়েক হাজার ভূত পেত্নি খাবার নিয়ে হৈ হল্লা জুড়েছে আর তাদের সংযম ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তার একার ক্ষমতাই বা কতটুকু। তাছাড়াও এখন তাদের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ানোও নিরাপদ নয়।

সে গিয়ে কিম ভূতের কাছে হাজির হল। কাঁদো কাঁদো হয়ে তার কানে ফিস-ফিস করে বললে, এ কী কাণ্ড শুরু হল বলত। ওদের এখন সামলাই কী করে? যারা কিছুই পাচ্ছে না তারা যে এখন আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

কিম ভূত চিন্তিত হয়ে বললে, তাহলে। কেই বা এখন ওদের সামলাতে যাবে? ওদের সামলানোর আর তো কোনও উপায়ও দেখছি না—।

এখন একমাত্র বাঁচার পথ চুপি চুপি এখান থেকে পালানো। ভেবে দেখ পালাবি কী না?

ভূতি শুনে খুব খুশী হল না। বললে, আমি তো একা পালাতেই পারি। কিন্তু তুই তো মরে গিয়েছিস। তুই এখন পালাবি কী করে। মরা ভূত তো দৌড়তে পারে না।

তোকে যদি ওরা দেখে ফেলে তাহলে আমাদের দুজনকেই ওরা পুঁতে ফেলবে মাটিতে।

কিম ভূত গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে, তা বটে। বিপদ কঠিন বুঝতে পারছি।

হঠাৎ অভুক্ত ভূত পেতনিরা দল বেঁধে এগিয়ে আসতে লাগল নিমগাছের দিকে। নেমন্তন্ন করেও না খাওয়ানোর কৈফিয়ৎ চাইবে তারা।

ভূতি কিম ভূতের উদ্দেশে বললে, দেখছিস কাণ্ড!

কিম ভূত বললে, হুম—।

ভূতি বললে, আর নয়। দেরী হয়ে গেলে আর পালানোর পথও থাকবে না।

কিম ভূত তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। গাছ বেয়ে নামার সময় পর্যন্তও নেই। তারা বাবা ভূতনাথের নাম স্মরণ করে হাত ধরাধরি করে লাফমারল গাছ থেকে।

তারপর লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে উল্টোদিকে দৌড়তে শুরু করল।

তাহা যতই নিজেদের আড়াল করুক, ভূত পেতনিদের চোখ এড়াতে পারল না। একজন তাদের দৌড়তে দেখে বললে, আরে মরা ভূত দৌড়চ্ছে যেরে কী ব্যাপার। ম্যাজিক দেখছি নাকি?

প্রশ্নটা ভূতির কান এড়ায় নি। সে ভেবে দেখল, যখন ভূতেদের চোখে ধরাই পড়ে গিয়েছে আর লুকিয়ে লাভ নেই। স্বীকার করে নেওয়াই ভাল।

সে বললে, না না কিম ভূত মরেই গিয়েছে। মরে গিয়ে কেউ আবার বাঁচতে পারে নাকি। তবে বেঁচে থাকার সময় বে খিধেটা ছিল পেটে সেটা তো মরেনি। সেটা হঠাৎই চেগে উঠেছে। তাই ওকে কিছু খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি।

শুনে ভূতেরা থ'। তারা সবাই নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। একজন প্রবীণ ভূত বললে, আহারে ভূতেদেরও মরে শান্তি নেই। মরেও খিধেতে ছটফট করছে।

ভূতির কানে কথাগুলো পোঁছতে সে নিশ্চিন্ত হল। যাহোক্ তাহলে আর ভূতেদের পেছু ধাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাহলেও তারা থামল না।

ওরা অন্তর্ধান হতে তাদের নজর ঘুরে গিয়ে পড়ল রসগোল্লার গামলার দিকে। লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে ওরা গোগ্রাসে রসগোল্লা খাওয়া শুরু করল।

খেতে খেতে হঠাৎ ধাক্কাধাক্কি শুরু হল নিজেদের মধ্যে। তারপরেই লুটপাট শুরু করল ভূত পেতনিরা। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল রসের গামলার ভেতরে। সর্বাঙ্গ তাদের রসে মাখামাখি হতে সকলেই সকলের গা চাটতে লাগল।